নিরেট গুরুর কাহিনী

ও

অন্যান্য গল্প

সীতা দেবী

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক
অঙ্কিত চিত্র সংবলিত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

সূচীপত্র

নিরেট গুরুর কাহিনী

নিরেট গুরু ও তাঁহার শিষ্যরা নদী পার হইতেছেন।

পৃষ্ঠা ৩

নদী একজনকে খাইয়া লওয়ায় নিরেট গুরু ও তাঁর শিষ্যদের দুঃখ।

পৃষ্ঠা ৪

ওরে, দৌড়ান
বাচ্চাটা পালায়
পৃষ্ঠা :

র ছায়ায়
চ বসাইয়া
ন করিতে
ল।
পৃষ্ঠা ১

নিরেট গুরুর
ঘোড়ায় চড়া।
পৃষ্ঠা ২

সে ডালটায়
বসিয়াছিল
সেইটারই গোড়
কাটিতে আরম্ভ
করিল।
পৃষ্ঠা ২০

গুরু ডিগবাজী খাইয়া গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন।
পৃষ্ঠা ২৯

নিরেট গুরুকে শ্মশানে লইয়া চলিল।
পৃষ্ঠা ৩৮

দুরন্ত নদীর কথা

কোনও এক গ্রামে একজন গুরু বাস করিতেন ; তাঁহার নাম ছিল নিরেট। ইঁহার পাঁচজন শিষ্য, তাঁহাদের নাম, আকাট, হাবা, হাঁদা, বোকা এবং আহাম্মক।

কাছাকাছি গ্রামে গুরুর যে-সকল শিষ্য বাস করিত, তাহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য ইঁহারা ছজন বাহির হইয়াছিলেন। কাজ শেষ করিয়া আপনাদের মঠে ফিরিয়া আসিবার পথে, একদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তাঁহারা এক নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত।

গুরুর ধারণা ছিল নদীটি ভারী নিষ্ঠুর, সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ পার হইবার মোটেই সুবিধা হইবে না। নদী ঘুমাইয়া আছে কি জাগিয়া আছে, জানিয়া আসিবার জন্য তিনি বোকাকে হুকুম করিলেন। বোকা তখন বিড়ি টানিতেছিল, তাহারই আগুনে সে একটা মশাল জ্বালিল, এবং সেইটি হাতে লইয়া চলিল। নদীর কাছে আসিয়া, জল হইতে বেশ খানিক দূরে থাকিয়াই, হাত বাড়াইয়া মশালটাকে জলে ডুবাইয়া দিল।

জলে দিবামাত্রই জলটা হুস হুস শব্দ করিয়া উঠিল এবং ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোকা সেখান হইতে দে ছুট্! কত-বার যে সে আছাড় খাইল ও গড়াইয়া পড়িল, তাহার ঠিকই নাই, কিন্তু সেদিকে মোটেই তাহার খেয়াল ছিল না। সে দৌড়িতে দৌড়িতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "গুরুমশায়, গুরুমশায়, এখন নদী পার হবার সময় মোটেই নয়, ও জেগে রয়েছে। আমি তাকে যেই না ছোঁওয়া, সে অমনি রেগে ফোঁস ফোঁস ক'রে উঠল! আর ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে আমার দিকে লাফিয়ে এল। আমি যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি এই আশ্চর্য্য।" তাহার কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন, "আমরা দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি না।

আমরা এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করি।" ইহা বলিয়া গুরু তাঁহার শিষ্যদের লইয়া, নিকটেই একটি বাগানে ছায়ায় গিয়া বসিলেন। সময় কাটাইবার জন্য প্রত্যেকে এই নদীর বিষয়ে এক-একটি গল্প বলিতে লাগিল। আকাট বলিল—

"আমি আমার ঠাকুরদাদার কাছে এই নদীটার চালাকি আর অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। আমার ঠাকুরদাদা একজন মস্ত সওদাগর ছিলেন। একদিন তিনি আর তাঁর একজন বন্ধু দুটো গাধার পিঠে নুন বোঝাই ক'রে আসছিলেন। নদীটাতে নেমে মাঝামাঝি এসে তাঁরা একবার স্নান ক'রে নিলেন, জলটা মোটে তাঁদের কোমর অবধি ছিল, গ্রীষ্মকাল ব'লে তাঁরা একটু ক্লান্তও হয়েছিলেন। তারপর গাধাগুলোকে থামিয়ে, তাঁরা সেগুলোকেও বেশ ক'রে স্নান করিয়ে নিলেন।

"নদী পার হয়ে এসে দেখেন কি যে নদীটা সব নুন চুরি ক'রে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, নুনটা জাদু ক'রে বের করেছে ; কারণ বস্তাগুলোর মুখ আচ্ছা ক'রে সেলাই করা ছিল, তা একটুও খোলেনি। ব্যাপার দে'খে তাঁরা খুব ফুর্ত্তি ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন, বাপ্‌রে বাপ্‌, এতখানি নুন খেয়ে ফেলেছে! আমাদের যে ছেড়ে দিয়েছে তাই বেজায় ভাগ্যি বল্‌তে হবে।"

হাঁদা তখন আর এক গল্প আরম্ভ করিল—

"এই নদীটার ফন্দি ফিকির আর চুরি আমার বয়সেই আমি ঢের দেখেছি। একবারের কাণ্ড শোন। একটা কুকুর এক টুক্‌রো মাংস মুখে নিয়ে এই নদীতে সাঁতার দিচ্ছিল, এমন সময় নদীটা ফন্দি ক'রে নিজের জলের ভিতর আর এক টুক্‌রো মাংস দেখাল। কুকুর বেচারা দেখল যে জলের ভিতর যে টুকরোটা রয়েছে, সেইটাই বড়। কাজেই সে নিজের মুখের মাংসটা ফে'লে যেই সেটা নিতে গেল, অমনি দু টুক্‌রোই গেল। বেচারা কুকুর আর কি করে ; খালি পেটেই বাড়ী ফির্‌ল।"

এইরূপে গল্প করিতে করিতে তাহারা দেখিল যে নদীর ওপার হইতে

একজন ঘোড়সওয়ার আসিতেছে। নদীতে তখন মাত্র এক বিঘৎ খানিক জল, কাজেই লোকটি নির্ভয়ে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়াই, ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জল পার হইয়া এপারে আসিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া শিষ্যেরা সকলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায় হায়, আমাদের গুরুর যদি একটি ঘোড়া থাকত, তাহলে আমরা সবাই নির্ভয়ে জলে নামতে পারতাম।" গুরু নিরেট বলিলেন, "এবিষয়ে আমাদের পরে কথা হবে।"

দিন শেষ হইয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল. কাজেই গুরু এই সময় আর একবার নদী জাগিয়া আছে কিনা পরীক্ষা করিতে পাঠাইলেন। এবারে হাবা আগেকার সেই মশালের কাঠখানা লইয়া চলিল এবং জলের কাছে গিয়াই কাঠখানা ডুবাইয়া দিল। কাঠখানার আগুন আগেই নিবিয়া গিয়াছিল, কাজেই এবারে জল একটুও শব্দ করিল না, বা লাফাইয়া উঠিল না। ইহা দেখিয়া হাবা পরম আনন্দে ছুটিয়া চলিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এইবার সময় হয়েছে; শীগ্‌গির এসো, দেখো যেন টুঁ শব্দটিও কোরো না; নদীটা এখন খুব ঘুমচ্ছে, এখন আর ভয়-ডরের কোনও দরকার নেই।"

হাবা চীৎকার করিয়া এই সুখবর দিবামাত্রই তাহারা সকলে লাফাইয়া উঠিল এবং একটি কথাও না বলিয়া ছজনে আসিয়া অতি সাবধানে জলে নামিল। তাহারা এত আস্তে আস্তে পা ফেলিতেছিল যে জলে কোনও রকম শব্দ হইল না। ভয়ে তখনও তাহাদের বুক কাঁপিতেছিল; এইরূপে তাহারা নদীর ওপারে আসিয়া পৌঁছিল।

তীরে উঠিয়াই তাহাদের ফূর্ত্তি আর দেখে কে? আগে যে অত ভয় পাইয়াছিল তাহার আর চিহ্নই দেখা গেল না, মহা আনন্দে সকলে মিলিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল। নদী ত পার হওয়া হইল, এখন সবাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা, তাহা ত দেখা চাই। আহাম্মক সকলের পিছনে ছিল, সেই গুণিতে আরম্ভ করিল। সে নিজেকে বাদ দিয়া আর সকলকেই গুণিল। গুণিয়া যখন দেখিল যে মোটে পাঁচজন হইল, তখন ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায় হায়, আমাদের মধ্যে

একজন জলে ডুবে মারা গিয়েছে। গুরুমশায়, দেখুন, আমরা মোটে পাঁচটি এখানে রয়েছি।" গুরু তাড়াতাড়ি তাহাদের সকলকে সার দিয়া দাঁড় করাইয়া, তিন-চারবার গুণিয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনিও নিজেকে বাদ দিয়া গোণাতে ফল সেই পাঁচই দাঁড়াইল। তখন প্রত্যেকেই এক একবার গুণিয়া দেখিল, কিন্তু কেহই নিজেকে গুণিবার কথা ভাবিল না; কাজেই শেষে তাহারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিল যে, নদী তাহাদের একটিকে খাইয়া ফেলিয়াছে।

তখন তাহারা সকলে খুব চেঁচাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং একজন আর-একজনকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে পাষণ্ড নদী, তুই পাষাণের চেয়েও কঠিন, বাঘের থেকেও নিষ্ঠুর। আমাদের গুরু নিরেটকে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পৃথিবীর এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর শিষ্যকে গিলে খেতে কি তোর একটুও ভয় হল না রে? তোর কি এতই সাহস? তোর পরকালে কি গতি হবে রে? তুই কি এমন কাজ করবার পরেও বেঁচে থাকবি? তুই যেন একেবারে শুকিয়ে যাস, তোর ঢেউগুলো যেন পুড়ে যায়, তোর যেখানে জল ছিল, সেখানটা যেন কাঁটায় ভরে যায়।"

এই রকম করিয়া তাহারা খানিকক্ষণ হাত বাড়াইয়া, আঙুল মট্‌কাইয়া নদীটাকে খুব অভিশাপ দিল। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে বুদ্ধিমানেরা, তাহাদের মধ্যে যে কে ডুবিয়া মরিয়াছে তাহার খোঁজ একবারও লইল না, চেঁচানোর দিকেই তখন তাহাদের মন। একটি লোক সেইখান দিয়া যাইতেছিল, সে তাহাদের কান্নাকাটি শুনিয়া, দয়া করিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বাপু, ব্যাপার কি? সবাই মিলে অত গণ্ডগোল বাধিয়েছ কেন?" ব্যাপারখানা যে কি, তাহা তখন সকলে খুলিয়া বলিল। লোকটি তাহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বলিল, "যা হয়ে গিয়েছে, তার আর কি করা যাবে? কিন্তু তোমরা যদি আমাকে ভাল রকম বক্‌শিশ দাও তাহলে আমি যে নদীতে ডুবে গিয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, কারণ আমার জাদুবিদ্যাটা খুব

ভাল রকম জানা আছে।"

গুরু খুব খুশী হইয়া বলিলেন, "তুমি যদি তা করতে পার, তাহলে আমরা আমাদের পথ খরচের জন্য যত টাকা এনেছি সব তোমাকে দেব।"

লোকটি তখন একখানা লাঠি উঁচু করিয়া দেখাইয়া বলিল, "আমার বিদ্যাটা এরি মধ্যে আছে। তোমরা সকলে সার দিয়ে দাঁড়াও, আর তোমাদের পিঠে যেই লাঠি পড়বে, অমনি যদি প্রত্যেকে নিজের নাম বলে চেঁচিয়ে ওঠ, তাহলেই দেখবে যে তোমরা ছজনেই এখানে রয়েছ।" এই বলিয়া সে সকলকে সার দিয়া দাঁড় করাইল, এবং প্রথমেই গুরুর পিঠে ধাঁই করিয়া এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিল।

গুরু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওহে আমি হচ্ছি গুরু।" লোকটি বলিল, "এক"। এই রকম করিয়া সে প্রত্যেককেই এক এক ঘা লাঠি লাগাইল, এবং তাহারা যেই আপন আপন নাম বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, অমনি গুণিয়া যাইতে লাগিল। শেষে তাহারা সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে ছজনই রহিয়াছে, একজনও বাদ পড়ে নাই। তখন তাহারা লোকটির যথেষ্ট প্রশংসা ত করিলই, তার উপর থলি ঝাড়িয়া সব টাকাকড়ি তাহাকে দিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ঘোড়ার ডিম কেনার গল্প

গুরু নিরেট আর তাঁর পাঁচ শিষ্য মঠে ফিরিয়া আসিয়া, নদী পার হইবার সময় তাঁহারা যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার খবর সকলকেই দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

মঠের ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিবার জন্য একজন কানা বুড়ী ঝি ছিল, সে তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিল, "আমার মনে হচ্ছে যে আপনাদের

গুণবার রকমটা একটু বেঠিক হয়েছিল। গুণবার সময় নিজেকে কি আর কাউকে বাদ দিয়ে ফেল্লেই ত মাটি। যা হোক, যদি আপনারা আবার কখনও ঐ রকম বিপদে পড়েন, এই জন্য আপনাদের আমি ঠিকমত গুণবার একটা উপায় ব'লে দিচ্ছি। মাঠে যত গোবর প'ড়ে থাকবে, সব কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড় করবেন; তারপর সেটাকে থাবড়ে থুবড়ে বেশ গোল করবেন। সবাই মিলে তখন সেইটার চারধারে জুটে, একে একে তাতে নিজের নাক ডুবাবেন। এমনি করলেই প্রত্যেকের নাকের তাতে চমৎকার ছাপ প'ড়ে যাবে, আর সেই ছাপ কটা গুণে নিলেই কাজ চুকে যাবে। পঞ্চাশ ষাট বচ্ছর আগে আমরা এমনি ক'রে একদল মেয়েকে গুণেছিলাম।"

বুড়ীর পরামর্শ শুনিয়া তাহারা সকলেই খুসী হইয়া বলিল, "উপায়টা খুব চমৎকার বটে। এতে কোনো টাকা খরচও নেই; এটা কিন্তু আমাদের কারুর মাথায় ঢোকে নি। যা হোক সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের একটা ঘোড়া কেনাই সব থেকে সুবিধের। গুরুমশায়, আপনাকে একটা ঘোড়া কিনতেই হচ্ছে।" গুরু শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে একটি ঘোড়ার দাম কত। তাহারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানিল যে দুই-তিন শ টাকার কমে একটা ঘোড়া কেনা চলিবে না। গুরু তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে অত টাকা দিবার ক্ষমতা তাঁহার হইবে না। যা হোক, কথাটা ঐখানেই থামিয়া গেল না, কিছু দিন ধরিয়া তাহার আলোচনা চলিল।

গুরুর একটি গরু ছিল, একদিন সেটা মাঠে চরিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। চেলার দল তাহাকে সারা গ্রামময় খুঁজিয়া বেড়াইয়াও পাইল না, কাজে কাজেই তার পরদিন আকাট আশে-পাশের গাঁয়ে তাহার খোঁজ করিতে গেল।

তিন দিন পরে সে ফিরিয়া আসিল, গরুর কোনও খোঁজ সে পায় নাই, কিন্তু তাহার জন্য তাহার ফুর্ত্তির কোনও কমতি দেখা গেল না। সে মাঠে পা দিয়াই পরম আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "গুরুমশায়,

আমি গরুটাকে কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। যাক, তার জন্যে আর কোনও চিন্তা নেই, আমি আপনার জন্য খুব কম দামে একটা ঘোড়ার সন্ধান ক'রে এসেছি।"

গুরু উৎসাহে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

আকাট বলিল, "আমি যখন রাজ্যের মাঠ ঘাট বন বাদার খুঁজে, ফিরে আসছি, তখন দেখলাম যে একটা পুকুরের ধারে গোটা পাঁচ ছয় ঘোড়া চ'রে বেড়াচ্ছে। আর একটু দূরে গিয়ে দেখলাম যে এক জায়গায় অনেকগুলো ঘোড়ার ডিম ঝুলছে। এক একটা ডিম এত বড় যে দু-হাত দিয়ে ধরা যায় না। একজন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম যে সেগুলো সত্যিই ঘোড়ার ডিম, আর এক্-একটার দাম কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশীও নয়। গুরুমশায়, এমন সুবিধা আর পাবেন না, অল্প দামে একটা খুব ভাল ঘোড়ার ডিম পাওয়া যাবে আর বাচ্চাটাকে খুব ভাল ক'রে সব শিখিয়ে নিলে সেটা শান্ত শিষ্টও বেশ হবে।"

একথা শুনিয়া সকলেই ডিম কিনিতে রাজি হইল, এবং আকাটের হাতে পঁচিশ টাকা দিয়া ও হাবাকে তাহার সঙ্গে দিয়া ঘোড়ার ডিম কিনিতে পাঠাইয়া দিল।

তাহারা দুইজনে চলিয়া যাইবার পর হঠাৎ আহাম্মকের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে বলিল, "আচ্ছা, একটা খুব ভাল ঘোড়ার ডিম না-হয় পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে, 'তা' না দিলে ত ডিম ফুটবে না। কিন্তু 'তা' যে কে দেবে, তা ত আমি ভেবেই পাচ্ছি না। আকাট ত বল্‌ল যে এক একটা ডিম দু-হাতে ধরা যায় না, তা হলে আমরা সেটার উপর দশটা মুরগী রাখলেও তারা ডিমটার উপর দাঁড়িয়েও থাক্‌তে পারবে না, সেটাকে ঢেকে রাখা ত দূরে থাক্। এখন বল দেখি, কি ক'রে কাজ হাসিল করা যায়?"

আহাম্মকের কথা শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া এ উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, এত বড় কঠিন প্রশ্নের উত্তর আর কাহারও মুখ দিয়া

বাহির হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গুরু শেষে তাঁহার তিন শিষ্যকে বলিলেন, আমাদের একজনকেই ওটার উপর ব'সে 'তা' দিতে হবে, এছাড়া ত আর কোনও উপায় দেখছি না!"

গুরুর কথা শুনিয়াই প্রত্যেকে মহা ব্যস্ত ভাবে প্রমাণ করিতে বসিয়া গেল যে, তাহাদের একেবারেই ও রকম কাজ করিবার অবসর নাই, তাহারা সারাক্ষণই কাজে ব্যস্ত থাকে। একজন বলিল, "দিনে যত জল লাগে, সমস্তই আমাকে নদীর থেকে আনতে হয়, তাছাড়া জ্বালানী কাঠও সব আমাকে আনতে হয়; আমার সময় কোথায়?" আর একজন বলিল, "আমি ত সারাদিন রান্নাঘরেই আছি, ভাত তরকারী রাঁধতে নানা রকম পিঠে তৈরী করতে আর সকলের জল গরম করতে করতেই আমার প্রাণ যায়। আমি আবার ডিমে 'তা' দেব কি ক'রে?" বাকী যে জন ছিল সে বলিল, "ভোর হবার আগেই আমি উঠে নদীতে গিয়ে দাঁত মেজে মুখ হাত ধুই, আর যা-কিছু করবার সব ঠিক শাস্তর মেনে করি। তারপর বাগানে গিয়ে ফুল তুলে এনে, মালা গেঁথে, এখানে যতগুলি ঠাকুর আছে সব-কজনের পূজো করি আর তাদের উপর ফুল ছড়াই। আমার ত এত কাজ, তার উপর আবার ডিম ফুটাতে বসব কখন?"

তাহাদের সকলের কথা শেষ হইলে গুরু বলিলেন, "এ সবই সত্যি কথা, তোমরা ডিমের ভার নিতে পারবে না, আর যে দুজন সেটা কিনতে গেছে, তাদের দিয়েও ও-কাজ করানো চলবে না, কারণ তাদের মধ্যে একজন সারাদিন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যত লোকজন আসে সকলের খবর নেয় আর তারা যা-কিছু কথা বলে সব কথার উত্তর দেয়। আবার তাদের মধ্যে যদি ঝগড়াবিবাদ হয়, তাহলে তাকে সেটাও মিটিয়ে দিতে হয়। এই ত গেল হাবার কাজ, আর আকাটকে দিয়ে ত আমাদের যা-কিছু জিনিস দরকার সবই কেনানো হয়, সে বেচারা সারাদিনই মঠের থেকে গাঁয়ে আর গাঁয়ের থেকে মঠে ছুটাছুটি করে। তোমাদের কারুরই নিজের কাজকর্ম্ম ছেড়ে ব'সে থাকা চলবে

না। তা আমার ত কোনও কাজকর্ম্ম নেই, আমি না-হয় ও-কাজটা করব। আমি ডিমটাকে কোলে নিয়ে, সেটাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দুহাতে জাপটে ধরে থাকব, যথাসাধ্য যত্ন করব। ডিম ফুটে যখন ছানা বেরবে তখন আমাদের সকল কষ্ট সফল হবে।"

মঠে ত এসব বন্দোবস্ত হইতেছিল, এদিকে আকাট আর হাবা তখনও পথ চলিতেছে। অনেক পথ হাঁটিয়া তাহারা শেষে সেই পুকুরের ধারে আসিয়া পৌঁছিল। পুকুরটার পাড়ে খুব কুমড়া ফলিয়াছিল, এক-একটা তাহার মধ্যে খুব প্রকাণ্ড।

একটা লোক সেইখানে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। দুই বন্ধু তাহার কাছে গিয়া খুব মিনতি করিয়া বলিল, "মশায়, দয়া ক'রে আমাদের একটা ডিম দিন।"

লোকটা খরিদ্দারদের বুদ্ধির দৌড় বুঝিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "আহা হা, যা বললে আর কি! তোমাদের এমন ডিম কেনবার ক্ষমতা থাকলে ত? এর দাম কত তা জান?"

আকাট আর হাবা ভাবিল লোকটা বুঝি তাহাদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছে; তাহারা বলিল, "আরে যান যান মশায়, আমরা যেন আর জানি না যে একটা ডিমের দাম পঁচিশ টাকা। টাকা ক'টা নিয়ে, একটা ভাল দে'খে ডিম দিয়ে দাও বাপু, কেন মিছে গোলমাল কর?"

লোকটা দেখিল, আচ্ছা দাঁও মারা গিয়াছে। কাজেই সে একটু নরম হইয়া বলিল, "তোমরা ত দেখছি খাসা লোক হে! আচ্ছা তোমাদের গুণ দে'খে আমি অত কম দামেই ডিম দিতে রাজি হলাম। নাও, একটা ভাল দে'খে বেছে নাও, কিন্তু দেখ, সবাইকে যেন ব'লে বেড়িও না যে ডিমটা অত কমে পেয়েছ, তাহলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে।" দুই বন্ধুতে খুসী হইয়া বাছিয়া বাছিয়া সবার বড় কুমড়াটাকে বাহির করিল, এবং তার পরদিন ভোরে উঠিয়া বাড়ীর পথে ফিরিয়া চলিল।

হাবা আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল এবং আকাট ডিমটি মাথায়

লইয়া তাহার পিছনে চলিল। যাইতে যাইতে আকাট বলিল, "আমাদের বাপ-পিতামহরা বলতেন যে যারা তপস্যা করে, তারা নিজেদেরই কাজ এগিয়ে রাখে। আমরা তা এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের গুরু যে অত তপস্যা করেছিলেন, তার কেমন ফল পেলেন দেখ! এমন চমৎকার ঘোড়ার দাম কম ক'রে তিন-চার শ টাকা হবে, আমরা কিনা তাকে পঁচিশ টাকায় কিনলাম!"

হাবা বলিল, "তা আর বলতে? কথায় বলে, যা কিছু সুখ তা ধর্ম্মকর্ম্ম থেকেই পাওয়া যায়, আর যা-কিছু সে-সব কোনও কর্ম্মের জিনিসই নয়। ধর্ম্মকর্ম্মে লাভও যেমন আনন্দও তেমনই; যেখানেই ধর্ম্ম নেই সেখানেই দুঃখ। আমার বাবা অনেক তপস্যা করেছিলেন, তাই না শেষে এত সুখ পেলেন তা না হলে কি আর আমার মত ছেলে হয়?"

আকাট বলিল, "এ কথায় কি আর কোনও সন্দেহ আছে? যেমন রুইবে, তেমনি ফলবে। ভাল কাজের ফল ভাল হবে, মন্দ কাজের ফল মন্দ হবে।"

এমনি ভাবে গল্প করিতে করিতে তাহারা অনেক দূর পথ চলিয়া আসিল। তাহারা যে পথে আসিতেছিল তাহার মাঝখানে একটা গাছ, উহার ডালপালাগুলা রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আকাট কুমড়া মাথায় করিয়া গাছটার তলায় আসিবামাত্র একটা ডালে ধাক্কা খাইল এবং কুমড়াটা তাহার মাথা হইতে ছিটকাইয়া রাস্তায় পড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। পথের ধারে, ঝোপের মধ্যে একটা খরগোস বসিয়াছিল, সে কুমড়া ফাটার শব্দে লাফাইয়া উঠিয়া এক দৌড় দিল। "ঐ রে, ঘোড়ার বাচ্চাটা পালাল" বলিয়া তাহারা দুজনেই খরগোসটার পিছনে তাড়া করিয়া ছুটিল। দৌড়িতে দৌড়িতে কাঁটা গাছে লাগিয়া তাহাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গেল, খোঁচা লাগিয়া গা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল, তবুও তাহারা দৌড়িতে ছাড়িল না। শেষে ঘোড়ার বাচ্চা যখন আর চোখেও দেখা গেল না তখন তাহারা হতাশ হইয়া

রাস্তায় শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া যে দিকে খরগোসটাকে শেষ দেখা গিয়াছিল সেইদিকে খানিকক্ষণ খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু বাচ্চাটার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তখন তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া আসিতেছে, কাজেই শেষে তাহারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মঠে ফিরিয়া আসিল।

মঠের দরজায় আসিয়াই তাহারা কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, "হায় হায় আমাদের কি হল গো!"

তাহাদের চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের টানিয়া তুলিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ব্যাপার কি? তোমাদের কি হয়েছে?"

দুইজনে তখন আপনাদের কাণ্ডকারখানা সব খুলিয়া বলিল। আকাট বলিল, "গুরুমশায়, বলব কি, জন্মে এমন তেজিয়ান ঘোড়া দেখিনি, রংটা তার পাঁশুটে, মাঝে মাঝে একটু কালোর ছিট আছে, লম্বা চওড়ায় প্রায় একটা খরগোসের সমান। সবেমাত্র ডিম ফুটে বেরিয়েছে কিন্তু কান খাড়া ক'রে আর লেজ গুটিয়ে যা ছুটটা দিল, সে আর কি বলব!"

ঘোড়ার বর্ণনা শুনিয়া সবাই হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গুরু বলিলেন, "টাকাগুলো গেল বটে, কিন্তু ঘোড়ার বাচ্চাটাও গিয়ে ভালই হয়েছে। বাচ্চাতেই এত তেজ, যখন বড় হবে তখন তার উপরে চড়বে কে? আমি বাপু বুড়ো মানুষ, আমার কি ও সব পোষায়? অমন ঘোড়া আমাকে কেউ দিলেও আমি নিই না।"

ষাঁড়ে চড়িয়া বেড়ানোর গল্প

কিছুকাল পরে একবার গুরুর অনেক দূর দেশে যাইবার দরকার হইল। পায়ে হাঁটিয়া ত গুরু অতদূর যাইতে পারেন না, কাজেই শিষ্যদের ত মহা ভাবনা। শেষে ঠিক হইল যে একটা ষাঁড় ভাড়া করিয়া, তাহার উপর চড়িয়া যাওয়া হইবে। কাছাকাছিই একটি ষাঁড় পাওয়া গেল, জন্তুটির গুণ আবার অনেক! শিং দুটি খট্‌খট্ করিয়া নড়ে। ষাঁড়ের মালিককে রোজ তিন আনা ভাড়া দেওয়া স্থির হইল এবং কাজকর্ম্ম সারিয়া বিকাল বেলা সকলে মহা আনন্দে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন গ্রীষ্মকাল, কাজেই হাঁটিতে হাঁটিতে যখন তাহারা একটা খোলা মাঠে আসিয়া হাজির হইল, তখন গরমে তাহাদের ভারী কষ্ট হইতে লাগিল। মাঠটি এমন যে তাহাতে একটিও গাছ নাই, যে, ছায়ায় বসিয়া বেচারারা একটু বিশ্রাম করে। গুরুর যা অবস্থা হইল, সে আর বলিবার কথা নয়। বুড়া মানুষ, রোদের ঝাঁঝে একেবারে মুষড়াইয়া গেলেন, ষাঁড়ের পিঠ হইতে পড়িয়া যান আর কি! শিষ্যেরা দেখিল যে গুরু মারা যান, কাজেই তাহারা তাড়াতাড়ি ধরাধরি করিয়া ষাঁড় হইতে গুরুকে নামাইয়া দিল। আর কোথাও ছায়া নাই, কাজেই ষাঁড়টাকে থামাইয়া, তাহারই ছায়ায় তাঁহাকে বসাইয়া নিজেদের কাপড় দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে গুরু একটু সুস্থ হইলেন, একটু একটু বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি আবার ষাঁড়ে চড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সন্ধ্যার আগেই একটা গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন।

কাছাকাছি একটা ছোটখাট সরাই দেখিয়া তাঁহারা সকলে সেখানে গিয়া উঠিলেন। ষাঁড়ের মালিককে চুক্তিমত তিন আনা পয়সা দেওয়া হইল। সে তাহা না লইয়া এই বলিয়া মহা গোলমাল আরম্ভ করিল,

যে, তাহাকে যত দেওয়া উচিত তাহা দেওয়া হয় নাই। শিষ্যরা বলিল, "সে কি হে বাপু, তোমার সঙ্গে ত এই রকমই কথাবার্ত্তা হয়েছিল।"

লোকটি চীৎকার করিয়া বলিল, "ষাঁড়ের ভাড়া তিন আনাই ঠিক হয়েছিল বটে; কিন্তু এ দামে যে আমি তার ছায়াটাও দেব এমন কথা ত হয়নি। তোমরা ছায়া নিলে কেন? আমি তার জন্য আলাদা পয়সা নেব।"

চেলারা বলিল, "এ বাপু তোমার জুয়াচুরি।"

তখন দুই পক্ষে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। গ্রামের যত লোক আসিয়া জুটিল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বিচারপতিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই পক্ষের নালিশ শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহারা তাহাই মানিয়া লইতে রাজি আছে কি না। দুই দলই তাঁহার কথায় রাজি হইল। তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আমি একবার দূরদেশ থেকে বাড়ী ফিরে আসছিলাম। একদিন রাত্রে আমি একটা মস্ত বড় সরাইয়ে গিয়ে উঠলাম। সেখানে থাকবার জায়গা ত পাওয়া যেতই, তার উপর খাবার টাবার যা-কিছু দরকার সবই সরাইয়ের লোকেরাই জোগাত। আমার হাতে তখন টাকাকড়ি বেশী ছিল না, পথ খরচ নিয়েই টানাটানি, কাজেই আমি বল্লাম যে আমার কিছুই দরকার নেই। আমি যে-ঘরে বসে ছিলাম সেটা হচ্ছে রান্নাঘর, সেখানে সব লোকজনের জন্য রান্না হচ্ছিল। একটা লোহার শলাতে বিঁধিয়ে একটা ভেড়ার ঠ্যাং আগুনে ঝলসানো হচ্ছিল, একজন লোক মাঝে মাঝে শলাটা ঘুরিয়ে দিচ্ছিল, যাতে মাংসটা পুড়ে না যায়। মাংসের থেকে অল্প অল্প ধুঁয়ো বেরুচ্ছিল, আর যা চমৎকার গন্ধ উঠেছিল তা আর কি বলব! আমার মাথায় তখন এক ফন্দী এল, ভাবলাম, আমার সঙ্গে ত কোন রকম তরকারি নেই, শুধু চারটি ভাত আছে, এই গন্ধের মধ্যে ব'সে যদি সেটা খাওয়া যায় তা হলে ত দিব্যি হয়। ঠিক মনে হবে যেন মাংস দিয়েই ভাত খাচ্ছি। আমি তখন গিয়ে

সরাইওয়ালাকে বললাম, যে, আমি খানিকক্ষণ শলাটা ঘুরাতে চাই। বিনা পয়সায় কাজ পাবার নামে সে ত খুসী হয়েই রাজি হল। আমি তখন ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে সেইখানে বসলাম, এক হাত দিয়ে ভাত খেতে লাগলাম, আর অন্য হাত দিয়ে মাংস ঘুরাতে লাগলাম। খেয়ে দেয়ে চ'লে যাব, এমন সময় সরাইয়ের কর্ত্তা এসে বলল, 'কি হে, দিব্যি ত চ'লে যাচ্ছ, আমার যে অতখানি মাংসের গন্ধ শুঁকে গেলে তার দাম দেবে না?' আমি ত তার কথা শুনে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলাম, খুব ঝগড়া বেধে গেল; শেষে ঝগড়া করতে করতে দুজনে গাঁয়ের মোড়লের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। মোড়ল খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক, আইন-কানুন তাঁর খুব ভাল রকমই জানা ছিল। তিনি বিচার ক'রে বললেন, 'আমার মত হচ্ছে এই, মাংস যে খেয়েছে, সে টাকা দেবে, আর যে মাংসের গন্ধ শুঁকেছে, তাকে টাকার গন্ধ দিতে হবে।' এই ব'লে তিনি এক থলি টাকা নিয়ে সরাইওয়ালার নাকের উপর ভয়ানক জোরে ঘষতে লাগলেন। সে ত প্রাণপণে চেঁচাতে আরম্ভ করল, 'ওরে বাবারে! আমার যথেষ্ট টাকা লাভ হয়েছে, আর চাই না, আমার নাকটা যে খ'সে গেল।' দেখ ত বাপু, কেমন চমৎকার বিচার! তোমাদের গোলমালটাও ঠিক এই আইন অনুসারে মিটমাট করা যায়। ষাঁড় চ'ড়ে এখানে আসবার জন্য টাকা ভাড়া দিতে হবে, কিন্তু তার ছায়াটা যে কাজে লাগিয়েছ, তার জন্য বাপু তোমাদের টাকার ছায়া দিতে হচ্ছে।"

গোলমাল ত চুকিয়া গেল, কিন্তু তখন সন্ধ্যা হওয়াতে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, কাজেই টাকার ছায়া পাওয়ার আর কোনও উপায় দেখা গেল না। বিচারক মহাশয় তখন ঠিক করিলেন যে ছায়ার অভাবে টাকার শব্দ দ্বারাই কাজ সারিতে হইবে এবং টাকার থলিটা লইয়া ষাঁড়ের মালিকের কানের উপর খুব জোরে পিটাইতে আরম্ভ করিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "শুনতে পাচ্ছিস ত? দেখিস, ভাল ক'রে শুনিস।"

লোকটা চীৎকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মশায়, চমৎকার শুনতে

পাচ্ছি, আর বেশী ষাঁড়ের ছায়ার ভাড়া পেলে কান কালা হয়ে যাবে। এইবার ছেড়ে দিন।”

গুরুও বলিলেন, “আমি যা ভোগ ভুগেছি তাতেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আমি আর ও-ষাঁড়ে চড়ছি না, ওটাকে দূর ক'রে দাও। পথ আর অল্পই বাকী আছে, সেটুকু আমি আস্তে আস্তে পায়ে হেঁটেই যাব। ষাঁড়ওয়ালা কানে হাত বুলাইতে বুলাইতে ষাঁড় লইয়া প্রস্থান করিল। গুরু এবং তাঁহার শিষ্যগণ গ্রামের বিচারপতির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আবার আপনাদের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ছিপ ফেলিয়া ঘোড়া ধরার গল্প

আগের দিন গরমে খুব কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিয়া এবার শিষ্যেরা খুব ভোর বেলাতেই পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু এবারেও বেচারাদের রক্ষা নাই। গুরুও হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা খুব আস্তে আস্তে যাইতেছিল, কাজেই বেশী দূর যাইবার আগেই রোদ উঠিয়া পড়িল এবং গরমে তাহাদের কষ্ট হইতে লাগিল। কাছেই একটা বাগান দেখা যাইতেছিল, তাহারা সকলে সেইখানে গিয়া বসিল, এবং সকলে মিলিয়া বাতাস খাইয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। এমন সময় বোকা ভাবিল, “আমি কেন এই বেলা স্নানটা সেরে নিই না? কাছে একটা পুকুরও ত আছে।”

সেই পুকুরের পাড়েই একটা মন্দির ছিল, আর মন্দিরের উঠানে একটা মস্ত বড় মাটির ঘোড়া দাঁড় করানো ছিল। ঘোড়াটা বোধ হয় কেহ দেবতার নিকট মানত করিয়া থাকিবে, ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে উঠানে রাখিয়া গিয়াছে। পুকুরটি জলে থই থই করিতেছিল, আর

জলটা পরিষ্কারও খুব ; কাজেই জলের মধ্যে ঘোড়াটার চমৎকার ছায়া পড়িয়াছিল। বোকা জলের মধ্যে একটা ঘোড়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, কিন্তু উপরের ঘোড়াটার দিকে চাহিয়া দেখিল যে সেটা এবং জলের ভিতরের ঘোড়াটা ঠিক এক রঙের এবং এক সমান, তখন তাহার মনে হইল যে, হয়ত জলের ভিতরের জিনিষটা আর একটা ঘোড়া নয়, উপরের ঘোড়ারই ছায়া।

এমন সময় একটু জোরে বাতাস বহাতে জলে ঢেউ উঠিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ছায়াটাও নড়িতে লাগিল বোকা তাড়াতাড়ি মাটির ঘোড়াটার দিকে চাহিয়া দেখিল যে সেটা মোটেই নড়িতেছে না, আগের মত চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে ; তখন তাহার স্থির বিশ্বাস হইল, যে, জলের ঘোড়াটা মাটির ঘোড়া হইতে একেবারে আলাদা, এবং সেটা নিশ্চয় বাঁচিয়াও আছে, তাহা না হইলে নড়িবে চড়িবে কেমন করিয়া? তবুও একেবারে সব সন্দেহ দূর করিবার জন্য সে জলে একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিল। জলে ঢিল পড়িবামাত্র ছায়াটা খুব জোরে নড়িয়া উঠিল। বোকার মনে হইল যে, ঘোড়াটা মাথা তুলিয়া, পা ছুঁড়িয়া খুব জোরে লাফাইতে লাগিল। সে তখন ভয় পাইয়া ছুটিয়া গিয়া নিজের সঙ্গীদের খবর দিল।

শুনিবামাত্র বোকার সঙ্গীরা ছুটিয়া গিয়া পুকুরের ধারে উপস্থিত সব দেখিয়া শুনিয়া তাহারা বুঝিল যে বোকা ঠিক কথাই বলিয়াছে। জলের ঘোড়াটাকে কি রকম করিয়া ধরা যাইতে পারে ইহাই এখন ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কেহই জলে নামিয়া সেটাকে ধরিতে রাজি হইল না, নানা জনে নানা রকম উপায় বাহির করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটার দ্বারাই কাজ উদ্ধার হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে ঠিক হইল যে ছিপ ফেলিয়া যেমন করিয়া মাছ ধরে, সেই রকমে ঘোড়াটাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে হইবে। ছিপে করিয়া ত ধরা হইবে, কিন্তু বঁড়শী কোথায়? পাঁচ বুদ্ধিমানের মধ্যে একজন একখানা কাস্তে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সেইখানাকেই বঁড়শী করা স্থির হইল। গুরুর

পাগড়ীতে কাস্তে বাঁধিয়া চমৎকার ছিপ তৈয়ারী হইল, টোপ হইল এক পোঁটলা ভাত, সেটাও এক শিষ্যের সম্পত্তি।

যাক, এইবারে ছিপটি জলে ফেলা হইল। জিনিষটি বিশেষ হালকা ছিল না, কাজেই খুব জোরে ঝপাৎ করিয়া গিয়া পুকুরে পড়িল। ঘোড়ার ছায়াটাও খুব জোরে নড়িয়া উঠিল। শিষ্যেরা দেখিল যে ঘোড়াটা ভয়ানক লাফাইতেছে এবং পা ছুঁড়িতেছে; তাহাদের ভয় হইল পাছে ঘোড়াটা লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া তাহাদের দুই-চার লাথি বসাইয়া দেয়। অতএব সকলে মিলিয়া সেখান হইতে দৌড় দিল। কেবল যে ছিপ ধরিয়াছিল সে পলাইল না, সেইখানেই বসিয়া রহিল।

খানিক পরেই জলটা একটু স্থির হইল, তখন সকলে আবার আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে ভাতের পুঁটলীতে মস্ত এক মাছ আসিয়া কামড় দিয়াছে, ছিপে টান পড়িবামাত্র যে ছিপ ধরিয়াছিল সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, ঘোড়াটা টোপ গিলছে।"

ইতিমধ্যে মাছটি পোঁটলাশুদ্ধ ভাত পার করিয়া বসিয়া আছে, আর কাস্তেখানি জলের মধ্যের কতকগুলি গাছপালায় আটকাইয়া গিয়াছে। ছিপ টানিয়া তুলিতে গিয়া তাহারা দেখিল যে সেটা উঠিতে চায় না, তখন সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "বঁড়শীটা একেবারে ঘোড়ার মুখে বিঁধে গিয়েছে, বাছা এইবার আমাদের হাতে এসেছেন।" ঘোড়াটাকে এইবার টানিয়া তুলিলেই হয়; সকলে মিলিয়া ছিপটাকে ধরিয়া খুব জোরে "হ্যাঁইও" করিয়া এক টান দিল আর সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ী ছিঁড়িয়া সকলেই চিৎপাত। পাগড়ী বেচারার বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, একে গুরুমশায় তাহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া মাথায় বাঁধিতেছিলেন, তার উপর পাঁচটি নাদুস-নুদুস শিষ্যের টান।

ঐ সময় সেখান দিয়া একজন ভালমানুষ গোছের লোক

যাইতেছিল। সে পুকুরপাড়ে পাঁচজন লোককে গড়াগড়ি যাইতে দেখিয়া, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাদের কি হইয়াছে। শিষ্যেরা সকল কথা খুলিয়া বলিল। সে ব্যক্তি দেখিল যে ইহাদের বুদ্ধি কিছু বেশী, ইহাদিগকে আপনাদের ভুল বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। সে তখন একখানা কাপড় আনিয়া মাটির ঘোড়াটাকে ঢাকিয়া দিল আর উহাদিগকে জলের ভিতর দেখিতে বলিল। জলের ঘোড়াটিকেও কাপড় ঢাকা দেখিয়া, তখন তাহারা ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিল। তখন তাহাদের মনে হইল, যে, এমন একজন ভাল লোক যখন পাওয়া গিয়াছে তখন তাহাকে আপনাদের সব সুখ-দুঃখের কথা খুলিয়া বলা উচিত। লোকটিকে লইয়া গিয়া তাহারা প্রথমে গুরুকে দেখাইল। তারপর নিজেদের একটা ঘোড়ার দরকার, সেই জন্য অল্প দামে একটা ঘোড়ার ডিম কেনা, সেই ডিমটা নষ্ট হইয়া যাওয়া এবং ষাঁড় ভাড়া করা, প্রভৃতি যত ঘরের কথা ছিল কিছুই বলিতে বাকী রাখিল না।

সে-লোকটি দেখিল যে ইহারা ভাল মানুষ, যদিও ইহাদের বুদ্ধি কিছু কম। বোকাদের প্রতি তাহার একটু দয়া হইল। সে বলিল "আমার একটা খোঁড়া ঘোড়া আছে, সেটা বুড়োও হয়েছে কাজেই তাতে চড়তে কোনও ভয়ের কারণ নেই। টাকাকড়ি কিছুই দিতে হবে না, আমি ঘোড়াটা অমনিই তোমাদের দেব। তোমরা সকলে আমার বাড়ী এস।" এই বলিয়া সে সকলকে লইয়া নিজের বাড়ী চলিল।

ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী যাওয়ার গল্প

সেই লোকটি গুরু শিষ্য সকলকেই আপনার গাঁয়ের বাড়ীতে লইয়া গেল। সে বিশেষ বড়লোক না হইলেও তাহার দান করা অভ্যাস ছিল, কাজেই সে অতিথিদের খুব ভাল করিয়াই খাওয়াইল,—

দই, ঘি, দুধ, কিছুরই কমতি হইল না। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাহারা মনের আনন্দে পান-সুপারী চিবাইতে লাগিল।

তার পর দিন সেই ঘোড়াও আসিয়া পৌঁছিল এবং ঘোড়ার মালিক গুরুজীকে সেটা দান করিল। ঘোড়াটি বুড়া ত বটেই, তার উপর আবার তাহার এক চোখ কানা, একটি কান কাটা এবং একটি পা খোঁড়া। এমন গুণের ঘোড়া গুরুমহাশয়কে খুবই মানাইয়াছিল, কারণ তাঁহার চেহারাও কতকটা ঐ গোছেরই। কিন্তু অমন ঘোড়া পাইয়াই গুরু আর তাঁহার চেলারা খুব খুসী হইয়া উঠিল; একে ঘোড়া পাওয়া গেল, তাও বিনা পয়সায়। আনন্দে তাহারা ঘোড়ার চারিধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিল। কেউ তাহার পা চাপড়ায়, কেউ তাহার পা ধরিয়া টানে, কেউ বা তাহার লেজ ধরিয়া ঝোলে!

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ছেঁড়া, পোকায় কাটা ঘোড়ার সাজ পাওয়া গেল, কিন্তু তার অনেক জায়গা একেবারেই উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু চেলারা হারিবার পাত্র নয়, যা-যা ছিল না সবই তাহারা অদ্ভুত উপায়ে যোগাড় করিয়া নিল। লাগামটা পাওয়া যাইতেছিল না, একজন চেলা মাঠ হইতে এক বোঝা ঘাস ছিঁড়িয়া আনিল, এবং সেইগুলো দড়ি পাকাইয়া চমৎকার লাগাম তৈরী হইয়া গেল। আর যা-কিছু বাকী ছিল, তাহা আকাট গাঁয়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনিল।

তারপর শুভমুহূর্ত্তে দিনক্ষণ দেখিয়া তাহারা বাহির হইল। তাহাদের যাইবার সময় খুবই ঘটা হইল, সমস্ত গাঁয়ের লোক চেঁচামেচি করিয়া বাহির হইয়া আসিল, কাজেই গোলমালটা কিছু কম হইল না। গুরু আগে আগে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন, পিছনে তাঁহার চেলারা জিনিষ-পত্র ঘাড়ে করিয়া চলিল। কিন্তু আবার এক মুস্কিল হইল, ঘোড়াটা কিছুতেই চলিতে চায় না। পাঁচ চেলায় মিলিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন তাহার লাগাম ধরিয়া

সামনের দিকে টানিতে লাগিল, আর একজন পিছনে দাঁড়াইয়া ধাক্কা মারিতে লাগিল, দুইজন দুইপাশে দাঁড়াইয়া গুরুর দুই পা ধরিয়া তাঁহাকে সামলাইয়া রাখিল, আর বাকীজন আগে আগে চীৎকার করিয়া চলিল, "সাবধান, সাবধান, স'রে যাও, স'রে যাও।"

এই রকম করিয়া খানিক পথ তাহারা বেশ আনন্দেই চলিল, এবং গাঁয়ের পথ ছাড়াইয়া, বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বড় রাস্তায় দাঁড়াইয়া একজন লোক মাশুল আদায় করিত, সে অত বড় এক দল দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, আসিয়াই ঘোড়াটার জন্য পাঁচ পয়সা মাশুল চাহিয়া বসিল। চেলারা রাগিয়া আগুন। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "গুরুমশায় চ'ড়ে যাচ্ছেন, এই ঘোড়ার মাশুল পাঁচ পয়সা ? আমরা কি ঘোড়াটাকে বেচতে নিয়ে যাচ্ছি না কিনেছি যে, তুমি মাশুল চাচ্ছ ? এটা একজন লোক ওঁকে চড়বার জন্য দিয়েছে।" সে লোকটা পয়সা না নিয়া ছাড়িবে না, চেলারাও পয়সা দিবে না, দুই পক্ষে ঝগড়া করিতে করিতে দুপুর হইয়া গেল। শেষে তাহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া ট্যাঁক হইতে পাঁচ পয়সা বাহির করিয়া, ঘোড়াটাকে মাশুলওয়ালার হাত হইতে উদ্ধার করিল। ঘোড়াটা না থাকিলে আর এই পাঁচ পয়সা খরচ করিতে হইত না এই ভাবিয়া গুরুর দুঃখের সীমা রহিল না।

পথে চলিতে চলিতে তাহারা খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাছেই একটা সরাই দেখিয়া, একটু বিশ্রাম করিবার জন্য সেইখানে গিয়া উঠিল। গুরু ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন যে একজন লোক বসিয়া রহিয়াছে ? তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখুন ত মশায়, আমি জন্মে অবধি কখনও ঘোড়ায় চড়িনি, আজ এই প্রথমবার চড়লাম, আর আজই কিনা আমার উপর এত অত্যাচার! সে যে আমার কাছ থেকে অন্যায় ক'রে পয়সা নিল, এতে কি তার ভাল হবে ? আমার বুক ফাটিয়ে যে পয়সা নিয়েছে সে পয়সা আগুন হয়ে তার হাত পুড়িয়ে দেবে।"

লোকটি বলিল, "আর মশায়, দুঃখ ক'রে কি করবেন? এই হচ্ছে আজকালকার নিয়ম। এখন টাকাই গুরু, টাকাই দেবতা। কথায় বলে, 'টাকার নাম করলে মরা মানুষ হাঁ করে।' টাকা ছাড়া এখন আর কেউ কিছু বোঝে না!"

গুরু বলিলেন, "এ কথা ঠিক, টাকা যদি গোবরের মধ্যেও থাকে তা হলেও লোকে সেটা চেটে চেটে বার করবে।"

আজকালকার লোকদের টাকার লোভ সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে দুপুর কাটিয়া গেল। বিকাল বেলায় আবার গুরু ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইলেন এবং রাত্রি হইলে পর একটি গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। চেলারা ভাবিল, "ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে কি হবে, বরং ছেড়ে দিলে বেশ সারারাত চ'রে খাবে!" এই ভাবিয়া তাহারা সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া ঘুমাইতে গেল।

সকালে উঠিয়া ঘোড়াটাকে আনিতে গিয়া তাহাকে কিছুতেই খুজিয়া পায় না। অনেক খোঁজাখুঁজি, গোলমালের পর জানা গেল যে একজন চাষা সেটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

শুনিয়াই ত সকলে দলবলে সেখানে গিয়া হাজির হইল এবং চাষাকে তাহাদের ঘোড়া ছাড়িয়া দিতে বলিল। সে ত দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "তা আর নয়! সারারাত ধ'রে তোমাদের ঘোড়া আমার ফসল খেয়েছে আর আমি এখন তাকে ছেড়ে দি! আমার জিনিষের দাম দেবে কে?"

মহা গোলমাল লাগিয়া গেল; গাঁয়ের মোড়ল ছুটিয়া আসিয়া চাষাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বুঝিবার পাত্রই নয়! কেবলই মাথা নাড়ে আর বলে, "আমার জিনিষের দাম দাও, আমি ঘোড়া ছেড়ে দিচ্ছি; তা না হলে কে ঘোড়া নেয়, আমি দেখব!" ক্রমে ক্রমে গাঁয়ের সব লোক আসিয়া জড় হইল এবং অনেক বকাবকির পর ঠিক হইল যে ঘোড়াটি প্রায় দুই-তিন টাকার জিনিষ খাইয়াছে আর নষ্ট করিয়াছে, সুতরাং চাষাকে তিন টাকাই

দেওয়া উচিত, তবে গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, আর এ গাঁয়ে অতিথির মত আসিয়াছেন, অতএব এক টাকা দিলেই তাঁহারা ঘোড়া ফিরিয়া পাইবেন। চাষাও এক টাকা লইয়া ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিল।

ঘোড়া ত পাওয়া গেল, কিন্তু এক টাকা খরচ হওয়াতে গুরু খুবই কাতর হইয়া পড়িলেন; তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "এ ঘোড়াটা পেয়ে আমার কি লাভ হল? এটাকে নেওয়ার পর থেকে আমার যে কত টাকা গেল আর কত দুঃখ লাঞ্ছনাই সইতে হ'ল তার আর লেখাজোখা নেই। এ-সব আর আমার বয়সে পোষায় না।" এই বলিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। চেলারা যদিও তাঁহাকে অনেক করিয়া ঘোড়ায় উঠিতে বলিল, তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া হাঁটিয়াই চলিলেন। ব্যাপার দেখিয়া চেলারা এবং গাঁয়ের লোকেরা এক জোট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "আরে মশাই, করেন কি, করেন কি? আপনার বয়সে কি হেঁটে যাওয়া চলে, না সেটা ভাল দেখায়?"

গোলমাল শুনিয়া একজন ভণ্ড দৈবজ্ঞ সেখানে আসিয়া হাজির হইল। সে সব দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "মশায়, আপনি দুঃখ করবেন না। নিশ্চয়ই ঘোড়াটার ভিতর অনেক পাপ আছে, তাই এ-সব কাণ্ড হচ্ছে। তা, আপনারা যদি আমাকে আট-নয় আনা পয়সা দেন, তাহলে আমি ওর সব পাপ খণ্ডিয়ে দিই।"

গুরু আর চেলারা পরামর্শ করিয়া দেখিল যে খরচের ভাবনা করিতে গেলে কাজ চলে না; তখন তাহারা লোকটার হাতে পয়সা দিয়া তাহাকে পাপ দূর করিতে বলিল।

লোকটা তখন তাহাদের ঠকাইবার জন্য অনেক রকম বুজরুকি আরম্ভ করিল। সে নানা রকম সুরে যা-তা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঘাস ছিঁড়িয়া ঘোড়াটার গায়ে ফেলিতে লাগিল, এবং উহার চার পাশে অনেকবার ডিগবাজি খাইল। শেষে ঘোড়াটাকে আচ্ছা

করিয়া চাপড়াইয়া তাহার কান ধরিয়া বলিল, "এই কানের ভিতরই ওর সব পাপ আছে। ইঃ, এ ঘোড়াটার দেখছি আগে ভয়ানক পাপ ছিল, একটা কান কেটে তবু খানিক কমেছে, এইটা কেটে দিলে একেবারে সব ঠিক হয়ে যাবে।" এই বলিয়া সে একখানা কাস্তে আনিয়া এক-কোপে ঘোড়ার কানটা কাটিয়া ফেলিল, এবং তৎক্ষণাৎ সেটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, পাছে পাপ কান হইতে বাহির হইয়া আর কাহারও গায়ে লাগিয়া যায়।

পাপ দূর করা দেখিতে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, কিন্তু পাপ দূর হইবামাত্র ঘোড়াটা চার পা তুলিয়া এমন এক লাফ দিল যে সকলে সেখান হইতে দে ছুট। তারপর সকলে মিলিয়া একটা খুব গভীর গর্ত খুড়িয়া, কানটাকে পুতিয়া ফেলিল। এই সব কাজেই দিনটা কাটিয়া গেল, কাজেই সে দিন আর তাহাদের যাওয়া হইল না। তার পর দিন বাহির হইয়া, অনেক কষ্ট ভুগিয়া তাহারা আপনাদের মঠে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎবাণী

মঠে ফিরিয়া আসিয়া গুরুর অত্যন্ত মন খারাপ হইয়া গেল। তাঁহার পাওয়া ঘোড়াটির অনেক দোষ, তাহা হইলেও সেটাকে যে কিনিতে হয় নাই, ইহাতেই তিনি খুসী ছিলেন। কিন্তু যখন এই ঘোড়ার জন্য তাঁহাকে কেবলই টাকা খরচ করিতে হইতে লাগিল আর নানারকম বিপদ ঘটিতে লাগিল, তখন তাঁহার মনের দুঃখ উথলিয়া উঠিল। তিনি সারা দিনরাত ধরিয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

শেষে একদিন নিজের সব শিষ্যদের ডাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বৎসগণ, আমি দেখছি যে পৃথিবীর সব সুখই মিথ্যা। দুঃখ ছাড়া

সুখ, মন্দ ছাড়া ভাল এখানে পাওয়া যায় না। যখন বিনা পয়সায় একটা ঘোড়া পেয়েছিলাম তখন আমাদের কত আনন্দই হয়েছিল! কিন্তু হায় হায়! দেখলে ত, তার পর দিন থেকেই আমাদের কত দুর্গতিই না হল। এক ফোঁটা মধুর জন্য আমাদের কতখানি ঝালই খেতে হল। পৃথিবীর গতিকই এই। এক কণা চাল যদি চাও তা হলেও সেটাকে তুষের ভেতর থেকে বের করতে হবে, আর যে কোনও ফলই খাও না, হয় তার খোসা ছাড়াতে হবে নয় তার একটা আঁঠি থাকবে। এ সবই সত্য বটে, তা হলেও আমি একদিনে এত ভোগ ভুগেছি যে মানুষে তা সইতে পারে না। ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়ানটা মোটেই আমার পক্ষে ঠিক নয়। আমার কপালে ওটা লেখা নেই, কাজেই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাহস ক'রে কাজ করতে নেই। তা হলে ঘোড়াটা যার কাছে পাওয়া গেছে তাকেই ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।"

গুরুর কথা শেষ হইতে না হইতে পাঁচ শিষ্য একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, "আরে মশায়, আপনি বলেন কি? এও কি একটা কথা হল? ঘোড়াটা ত আর আপনার কেনা ঘোড়া নয়, আর ওটাকে আমরা খুঁজে পেতেও আনি নি। আমাদের ঘোড়ার দরকার ছিল দে'খে ভগবান ওটাকে পাঠিয়ে দিলেন যে। এখন ভগবানের দেওয়া ঘোড়া ফিরিয়ে দিলে ভয়ানক পাপ হবে। তা ছাড়া এখন আর ভয় কি? সেই দৈবজ্ঞ ত ওর সব দোষ দূর ক'রে দিয়েছে।"

শিষ্যদের এত লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া গুরুর একটু সাহস হইল, তিনি তখন বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা যা বলছ তাই করা যাক। কিন্তু একবার ঘোড়াটাকে রাত্রে ছেড়ে দিয়ে যে রকম ভুগেছি আর ওকে ছাড়া হচ্ছে না। এবার থেকে ওটাকে রাত্রে বেঁধে রাখতে হবে; কিন্তু রাখব কোথায় সেই ত হচ্ছে ভাবনা।"

হাঁদা বলিল, "তার জন্য আবার ভাবনা কি? আমি এখুনি গিয়ে গাছের ডাল কেটে আনছি, দেখবেন এখন কেমন তোফা আস্তাবল বানিয়ে দেব।"

এই বলিয়াই হাঁদা বাহির হইয়া পড়িল। কিছুদূর গিয়া একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই গাছে চড়িয়া বসিল এবং যে ডালটাতে বসিয়া ছিল সেইটারই গোড়া দা দিয়া কাটিতে আরম্ভ করিল। একজন বামুন তখন সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, মাথার উপর ধুপধাপ শব্দ শুনিয়া উপরে চাহিয়া হাঁদার কীর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে, করছ কি? নিজেও যে ডালের সঙ্গে প'ড়ে মরবে?"

হাঁদা অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলিল, "কে হে তুমি? যত সব অমঙ্গলের কথা বলতে এলে?" বলিয়া একখানা ছুরি তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

ব্রাহ্মণ ভাবিল, "কোথাকার গাধা! মরুক্ গে, আমি কেন মার খাই।" সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল।

এদিকে হাঁদা সেই ডালটাতে আর কয়েক কোপ বসাইতেই ডালটা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেও ডালপালা সবশুদ্ধ দড়াম করিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল। প্রথমে সে খুব হাঁউ মাঁউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, তার পর একটু ঠাণ্ডা হইয়া ভাবিল, "নিশ্চয়ই সেই বামুন একজন দৈবজ্ঞ, তিনি যা বললেন ঠিক তাই ত হল!" এই ভাবিয়া সে উঠিয়া পড়িয়া সেই ব্রাহ্মণের পিছনে ছুটিয়া চলিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবিল বোকাটা না জানি আবার কি করে।

হাঁদা তাহার কাছে আসিয়া খুব ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মশায়, আপনি দেখছি একজন মস্ত পণ্ডিত, আপনি যা বললেন ঠিক তাই হল। তা আপনি আমায় আর একটা কথা দয়া ক'রে ব'লে দিন। আমি গুরু নিরেটের একজন শিষ্য, আমি তাঁকে বড্ড ভালবাসি। তিনি বুড়ো হয়েছেন, কখন মারা পড়েন, এই আমাদের ভয়। এখন আমায় একটু ব'লে দিন যে তিনি কখন মরবেন, আর মরবার আগে কি কি লক্ষণই বা দেখা যাবে।"

ব্রাহ্মণ হাঁদার হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য অনেক ওজর-আপত্তি

করিতে লাগিল কিন্তু ছাড়িয়া দিবার পাত্রই হাঁদা নয়। অবশেষে ব্রাহ্মণ বাধ্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা বলছি, 'চরণং শীতং জীবননাশম্'।" হাঁদা হাত জোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর মশায়, এর মানেটা বলে দিন।" ব্রাহ্মণ বলিল, "অর্থাৎ কিনা, যে দিনে তোমাদের গুরুর পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সেই দিনই তিনি মারা যাবেন," এই বলিয়াই সে দৌড় দিল।

হাঁদা তখন খুব খুশী হইয়া ডালটাকে টানিতে টানিতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল এবং সকলকে সব কথা খুলিয়া বলিল। গুরু অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সে বামুন যে একজন মস্ত পণ্ডিত তাতে কোনই ভুল নেই, কারণ তিনি তোমার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তোমারও ত ঠিক তাই হল। আমার সম্বন্ধেও যা বলেছেন, তা নিশ্চয়ই ঘটবে! তা এখন থেকে খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে, পা-টা আর ধোওয়া হবে না, তারপর ভগবানের যা ইচ্ছা।"

ঘোড়া হইতে পড়ার গল্প

ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎবাণীর পর কিছুদিন গুরু খুবই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। জল খাওয়া ছাড়া জলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখিলেন না। কখন জল পড়িয়া পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে বলা যায় না ত। কিন্তু ঘরে বসিয়া বেশীদিন চলে না, কারণ শিষ্য যজমানরা কেহই গুরুর বাড়ী আসিয়া টাকা দিয়া যাইত না। কাজেই গুরুকে আবার ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে শিষ্যবাড়ী ঘুরিতে আরম্ভ করিতে হইল।

একদিন গুরু ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, চেলার দল পিছনে হাঁটিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ধারে একটা গাছ ছিল, তার একটা

ডাল রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। গুরু গাছতলায় আসিবামাত্র তাঁহার পাগড়ীটা ডালের ঠোক্কর লাগিয়া ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। গুরু ভাবিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ নিশ্চয়ই পাগড়ীটা তুলিয়াছে অতএব তিনি ঘোড়া না থামাইয়া চলিতেই লাগিলেন। অনেক দূর চলিয়া যাইবার পর তাঁহার হঠাৎ মাথায় রোদ লাগাতে তিনি ঘোড়া থামাইয়া এক শিষ্যকে বলিলেন, "ওহে, আমার পাগড়ীটা দাও ত।"

সে খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, "আপনার পাগড়ী? সেটা ত সেই গাছতলায় প'ড়ে আছে।"

গুরু রাগিয়া বলিলেন, "কোন জিনিষ প'ড়ে গেলে সেটা কুড়িয়ে আনতে হয় তাও জান না নাকি?"

হাবা তাড়াতাড়ি সেই গাছতলায় দৌড়িয়া গিয়া পাগড়ীটা কুড়াইয়া লইল। উহা লইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে রাস্তায় আর-একটা জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিল। জিনিষটা গুরুমহাশয়ের ঘোড়ার বটে, তবে তুমি আমি তাহা কুড়াইয়া আনিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতাম না। কিন্তু হাবার কথা আলাদা, সে হইল গুরু নিরেটের চেলা, সে জিনিষটা কুড়াইয়া লইয়া গুরুর পাগড়ীর উপর রাখিয়া ফিরিয়া চলিল; —পড়িয়া গেলে জিনিষ কুড়াইয়া আনিতে গুরু বলিয়াছেন যে।

হাবা গুরুর হাতে পাগড়ী দিবামাত্র তিনি ব্যাপার দেখিয়া "আরে ছি ছি" বলিয়া চীৎকার করিয়া পাগড়ীটা দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং হাবাকে খুব বকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সব ক'জন শিষ্য তখন একজোট হইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "গুরুমশায়, এ কি? আপনিই না বলেছিলেন যে রাস্তায় যা কিছু প'ড়ে যাবে, সব কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে? হাবা ত ঠিক তাই করেছে, তবে আপনি অত বকছেন কেন?"

গুরু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "বলি, কোন্ জিনিসটা তুলতে হয় আর কোন্টা হয় না তা বুঝবার মত বুদ্ধিও কি তোমাদের ঘটে নেই?"

শিষ্যগণ মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "তাই যদি থাকবে তাহলে আর আমরা চেলা হতে এসেছি কিসের জন্য ? নিজেরাই ত এক-একজন গুরুমহাশয় হতে পারতাম ! তা আপনি কাগজে লিখে দিন যে কি কি জিনিষ প'ড়ে গেলে কুড়তে হবে, তা হলেই আমরা ঠিক ভাবে কাজ করতে পারব।" গুরু অগত্যা তাহাই করিলেন।

আরও খানিক দূর যাইবার পর আর এক বিপদ ঘটিল। বৃষ্টি হইয়া রাস্তাটা খুব পিছল হইয়াছিল, খোঁড়া ঘোড়াটা পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুও মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে করিয়া এক ডিগবাজী খাইয়া রাস্তার পাশে এক গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। তিনি সেইখান হইতেই "ওরে বাবারে, গেলুম রে, আমাকে শীগগির তোল রে," বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যেরা তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া গর্ত্তের ধারে হাজির হইল। একজন সেই কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল, পাগড়ী পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, কাপড় পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, চাদর পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, জামা পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, ইত্যাদি ; এবং বাকী ক'জন চট্‌পট্‌ গুরুর জামা কাপড় প্রভৃতি গর্ত্ত হইতে তুলিতে আরম্ভ করিল, বাকি রহিলেন কেবল গুরু নিজে। তিনি যতই চীৎকার করেন, "ওরে, আগে আমাকে তোল," বুদ্ধিমান চেলারা ততই মাথা নাড়ে, আর বলে, "আপনাকে তোলবার কথা ত কাগজে লেখা নেই। যা লেখা নেই তা আমরা কিছুতেই করছি না, আবার গাল খাই আর কি !" শত চীৎকার আর বকুনিতেও যখন কিছু হইল না, তখন গুরু তাহাদিগের নিকট হইতে কাগজখানা চাহিয়া লইলেন, আর সেই গর্ত্তের ভিতর বসিয়াই লিখিলেন, "আমি যদি পড়িয়া যাই, তাহা হইলে আমাকেও তুলিতে হইবে।"

কাগজখানা হাতে পাইবামাত্রই পাঁচ শিষ্য একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া গুরুকে টানিয়া তুলিল, গুরুর তখন যা অবস্থা ! সমস্ত শরীর কাদায় আর ময়লায় ভরিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দূরেই একটি

পুকুর ছিল, সেইখানে গিয়া তিনি স্নান করিয়া আবার কাপড়-চোপড় পরিলেন। তখন চেলারা তাঁহাকে আবার ঘোড়ায় চড়াইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তাহাদের যে কত বুদ্ধি সেই বিষয়ে গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই তাহারা সকলে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

নিরেট গুরুর মৃত্যু

গর্ত্তে পড়িয়া যাওয়ার গোলমালে গুরু ও তাঁহার চেলারা সকলেই বামুনের ভবিষ্যৎবাণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়ায় চড়িবার পর গুরুর হঠাৎ মনে হইল যে তাঁহার পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে; ভয়ে তাঁহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া উঠিল। তবে বাড়ী আসিয়া পৌঁছানো অবধি তিনি আর কিছু বলিলেন না।

বুড়া মানুষ ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গায়ে ত খুবই ব্যথা হইয়াছিল, তার উপর পা ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়ার ভয়। গুরুর আর সারা রাত ঘুম হইল না, বিছানায় পড়িয়া কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। গায়ের ব্যথা যে পড়িয়া গিয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহার মাথায় ঢুকিল না, তিনি বুঝিলেন যে, পা যখন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে তখন তাঁহার আর মরিবার দেরী নাই, তাই বোধ হয় এত কষ্ট। ভয়ে গোঁ গোঁ করিয়াই গুরুর রাত কাটিয়া গেল, ভোরবেলাই তিনি সব ক'জন চেলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া হাজির। গুরুর অবস্থা দেখিয়া তাহারা ত বেজায় ভড়কাইয়া গেল। তাঁহার চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, কথাও মুখ দিয়া ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না। হঠাৎ একটা মস্ত বড় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর দেখছ কি? এবার চিতার যোগাড় কর।"

পাঁচ চেলা হাঁউমাউ করিয়া লাফাইয়া উঠিল, "সে কি গুরু ঠাকুর ?"

গুরু বলিলেন, "আর কি ? 'চরণম্ শীতং জীবননাশম্' এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি ? কাল যে গর্ত্তটার মধ্যে প'ড়ে গিয়াছিলাম, সেটা কাদায় জলে ভর্ত্তি, তাইতে কখন যে পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তা টেরও পাইনি। যখন টের পেলাম, তখন আমার বামুনের কথা মনে প'ড়ে গেল। সেই থেকে সারারাত আমি ঘুমাইনি, আর যন্ত্রণাও কি কম ভোগ করেছি ? এখন বেশ বুঝতে পারছি, যে আমার মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে ; তা আর ভেবে কি হবে? এইবার পোড়াবার যোগাড় দেখ।"

চেলারা ভয় পাইয়াছিল খুবই, কিন্তু গুরুকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাহারা নানারকমে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিছুতেই যখন গুরুর ভয় গেল না, তখন তাহারা ঠিক করিল যে, গুরুকে ভূতে পাইয়া থাকিবে। চট্ করিয়া তাহারা গাঁয়ের ওঝাকে ডাকিয়া আনিল। ওঝা মহারাজ ভূত ঝাড়িতে খুবই ওস্তাদ। সে আসিয়া প্রথমে মন দিয়া সব কথা শুনিল ; তারপর দাঁত মুখ খিচাইয়া গুরুর খাটের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বলি, ও মশায়, হল কি আপনার ? কোনোখানে ব্যথাট্যাথা হয়েছে নাকি ?"

গুরু আর কোন উত্তর না দিয়া কেবলি চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিলেন, "চরণং শীতং জীবননাশম্"।

ওঝা চীৎকার করিয়া বলিল, "ও! সেই বামুন বেটা বুঝি বলেছে আপনাকে যে পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই আপনি মারা যাবেন ? কৈ সে, তাকে একবার দেখিয়ে দিন ত ? আমি তার পা গরম করেই তার দফা সারব, তার মাথায় ঢেঁকি পুজো ক'রে দেব, তা হলেই সব আপদ চুকে যাবে। একবার দেখিয়ে দিন না।"

গুরু তখন চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঢেঁকি পুজো ব'লে কিছু আছে নাকি ? কৈ, কখনও ত তার কথা শুনিনি! কি বল ত ?"

ওঝা তখন বলিতে আরম্ভ করিল, "এ পূজোটা এখানে হয় না বটে ; তা আমি সব বলছি শুনুন।—এক দেশে এক দোকানদার ছিল, সে রোজ একজন ক'রে অতিথিকে খাওয়াত। যেখানেই সে কোন লোককে দেখতে পেত, তাকে তখনই বাড়ী এনে হাজির করত। তার ছেলেপিলে ছিল না, বাড়ীতে খালি এক স্ত্রী। সে ত তার স্বামীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল, যখন তখন লোক এনে হাজির করছে, আর তাদের রেঁধে খাওয়াতে হচ্ছে। স্বামীকে কিছু ব'লেও লাভ নেই, সে মোটেই তা শুনবে না, কাজেই গিন্নি শেষে এক মতলব ঠাওরাল। সকালে বাজারে যেতেই সেদিন মুদীর সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হল। তাকে দেখে মুদী মহা খুসী হয়ে বলল, 'মশায়, যদি দয়া ক'রে আমার বাড়ী আজ পায়ের ধুলো দেন।' সে লোকটাও তখনই রাজী হয়ে গেল। মুদী তখন তাকে বলল, 'আমার একটু দেরী আছে, আপনি ততক্ষণ এগিয়ে যান্, আমার গিন্নিকে গিয়ে বলবেন যে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; তা হলেই হবে।' সে লোক ত গিয়ে মুদী গিন্নিকে হাঁকডাক ক'রে খবর দিল, গিন্নিও 'তা বেশ বাছা, এস বসো' ব'লে তাকে মাদুর বিছিয়ে বসাল। সে বসতেই গিন্নি উঠান ঝাঁট পাট দিয়ে গোবরজল ছড়া দিয়ে পরিষ্কার করল, নিজেও হাত-পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে এল। তারপর ঢেঁকিটাকে আচ্ছা করে ছাই দিয়ে ঘষতে সুরু করল, খানিক পরে সেটার সামনে শুয়ে প'ড়ে খুব ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে প্রণাম করতে লাগল, মন্ত্রও পড়তে লাগল কি সব বিড় বিড় ক'রে। তারপর ছাইগুলো ঝেড়ে ফে'লে উঠে পড়ল। অতিথিটি এতক্ষণ হাঁ ক'রে তার রকমসকম দেখছিল, তাকে উঠতে দে'খে সে বলল, 'বলি ও গিন্নিমা, এটা কি পূজো গা? এরকম ত কখনও দেখিনি।' মুদী-গিন্নি বলল, 'ও আমাদের জাতের একটা নূতন পূজো বাছা, খানিক পরেই বুঝতে পারবে ;' এই ব'লে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যেন আপন মনেই বলল, 'তোমার মাথায়ই ত পূজো শেষ করা হবে।' তার মতলবই ছিল যে, লোকটা শুনতে পায়, আর সে তা পেলও। মুদী-গিন্নি ঘরে

ঢুকতেই 'খুব বেঁচে গিয়েছি বাবা' ব'লে সে ভোঁ ক'রে ছুট্ দিল। সেও পালিয়েছে আর মুদীও বাড়ী এসে হাজির। সে এসেই হেঁকে বলল, 'হাঁ গা গিন্নি, যে লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম, সে গেল কোথায় ?' গিন্নি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলল, 'আহা যা না ছিরির লোক পাঠিয়েছিলে! এসেই আমাকে বলে কিনা, "ঢেঁকিটা আমাকে দাও।" আমি তাকে কত বুঝিয়ে বললুম যে মুদী এখুনি বাড়ী আসবে, যা চাইবার তার কাছেই চেও, আমি আর কি ক'রে দেব ; মাদুর পেতে বসতেও দিলুম। ওমা! সে দেখি রেগে গস্‌গসিয়ে বেরিয়ে গেল।' মুদী বলল, 'যত সব তোর বজ্জাতি, ঢেঁকি চাইছিল তাই দিলি নে কেন তাকে ? দেখ্ ত এখন ঘর থেকে না খেয়ে মানুষ চ'লে গেল। যাই এখন তাকে খুঁজে মরি।' সে ত বেরুল। এদিকে সেই লোকটা করেছে কি, মুদী এলে কি হয় তাই দেখবার জন্যে বাড়ীর কাছের একটা গলিতে লুকিয়ে আছে। মুদীকে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ছুটে বেরুতে দে'খে সে ভাবল, 'এই রে! নিশ্চয় আমাকে পাকড়াতে আসছে ;' সে ত অমনি দে ছুট! মুদী তাকে ছুটতে দেখে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওহে থাম না, ঢেঁকি নিয়ে যাও, ঢেঁকি নিয়ে যাও,' কিন্তু তাতে লাভ হল এই যে লোকটা ভড়কে গিয়ে আরও জোরে দৌড়ল। মুদী বেচারা মোটা মানুষ, মস্ত ভুঁড়ি তার, সে ছুটতে না পেরে বাড়ি ফিরে এল। এই হচ্ছে ঢেঁকি পূজো। সে লোকটাও যেমন শুধু শুধু ভয় পেয়েছিল, আপনিও দেখি তাই। এখন আপনার মরবার কোনই সম্ভাবনা নেই।"

গুরু তার গল্প শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "তুমি বেশ লোক বাপু, সাধে লোকে তোমায় মস্ত ঠাট্টাবাজ বলে ?"

গুরুকে হাসতে দে'খে চেলাদের যেন ধড়ে প্রাণ এল, তখন ওঝাও হাত নেড়ে বক্তৃতা করতে লাগল, "হাঁ, হাঁ, বামুন যা বলেছিল তা খাঁটি কথা বটে, তবে কিনা তার মানেটাও ঠিকমত বোঝা চাই। পা যদি ঠাণ্ডা হয় তা হলে মরবে বটে, কিন্তু এটা ত দেখতে হবে যে

পা-খানা শুধু শুধুই ঠাণ্ডা হল, না, জল-টল কিছু লেগে। আপনি জলে প'ড়ে গেলে যে পা ঠাণ্ডা হবে সে ত জানা কথা, না যদি হত তা'হলেই বরং অবাক হবার কথা। আপনি এখন নিশ্চিন্ত হোন, কোন ভয়ের কারণ নেই। এর পরে যদি কোনদিন বাইরের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও 'চরণং শীতম্' হয়, তাহলে অবশ্য তখন 'জীবননাশম্'-এর ভয় হবে। এখন কেন শুধুশুধু ভয় পাচ্ছেন ?"

ওঝার কথাটা গুরুঠাকুরের বেশ মনে লাগিল, তাঁহার ভয়টাও খানিকটা কমিয়া গেল। তিনি তখন খাওয়া-দাওয়া করিয়া উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ক'দিন এই ভাবে কাটিলে পর, একদিন রাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গুরুমহাশয় ঘুমাইতেছিলেন, কাজেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এমন কি, যখন খড়ের চাল ফুটা হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে বিছানাতে জল পড়িতে লাগিল, তখনও তাঁহার হুঁস নাই। খানিক পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল, গুরু কিন্তু সেই জায়গায় পা দিয়া ঘুমাইয়াই রহিলেন। ঠাণ্ডায় যখন তাঁহার পা প্রায় অসাড় হইয়া আসিয়াছে, তখন হঠাৎ তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। পা ঠাণ্ডা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহা হইলে ত তাঁহার মরিবার সময় উপস্থিত ; কারণ এখন ত বিনা কারণেই পা ঠাণ্ডা হইয়াছে। তিনি খুব জোরে চেঁচাইয়া চেলাদের ডাকিতে লাগিলেন। তাহারা ঘুম ছাড়িয়া ছুড়দাড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। গুরুর যে মরণ-কাল উপস্থিত সে বিষয়ে এবার আর চেলাদেরও সন্দেহ হইল না! এবার ত আর গুরু জলে পড়েন নাই ? পা ত আপনা-আপনিই ঠাণ্ডা হইয়াছে। আর বিছানাটা যে ঠাণ্ডা সে বোধ হয় গুরুর পা লাগিয়াই হইয়াছে। তাহাদের গোলমালে গাঁয়ের লোক আসিয়া জুটিল। তাহাদের বুদ্ধিও ঐ চেলা-দেরই কাছাকাছি, একই জাতের লোক ত। তাহারা ঠিক বুঝিল যে গুরুর আর মরিবার দেরি নাই। তাহারা সকলে গুরুর বিছানা ঘিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর নিরেট গুরু চোখ বুজিয়া মাঝে মাঝে

বলিতে লাগিলেন, "চরণং শীতং জীবননাশম্।"

ক'দিন এই ভাবে কাটিল। না খাইয়া না ঘুমাইয়া গুরু এত কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি শেষে একদিন মূর্চ্ছা গেলেন। আর কোথা যায়। তাঁহার চেলার দল ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিল, "ওগো, আমাদের গুরু-ঠাকুর আর নেই গো!"

খানিকক্ষণ কাঁদিয়া একজন বলিল, "আর কেঁদে কি হবে? যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন এঁর সৎকারের চেষ্টা দেখতে হবে। আগে স্নান করিয়ে নেওয়া যাক।"

মঠে একটা মস্ত চৌবাচ্চা ছিল, তাহার কানায় কানায় ভর্ত্তি জল। দুই চেলাতে ধরাধরি করিয়া গুরুকে সেই জলে ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া খুব করিয়া ঘষিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। জল লাগিবামাত্র গুরুর জ্ঞান হইল, কিন্তু জলের ভিতর থাকাতে তিনি কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না; হাত-পাও চেলারা ধরিয়া রাখিয়াছিল, কাজেই হাত নাড়িবারও জো ছিল না। এইরূপে খানিকক্ষণ থাকিয়া, মূর্খ চেলাদের বুদ্ধির দোষে গুরু নিশ্বাস আটকাইয়া মরিয়া গেলেন।

তখন চেলারা একখানা খাট আনিয়া তাঁহাকে বসাইল;—সে দেশের ঐরূপ রীতি। তাহার পর তাঁহাকে ভাল করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া চলিল। যত গাঁয়ের লোক আসিয়া তাহাদের দলে যোগ দিল। চেলারা গান করিতে করিতে চলিল, "চরণং শীতং জীবননাশম্।" শ্মশানে পৌছিয়া খুব ধুমধাম করিয়া গুরুকে পুড়াইয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

অন্যান্য গল্প

*

কথাসপ্তক

অরণ্য-ভৈরব

বহুকাল আগে এক পাহাড়-ঘেরা দুর্গে এক ক্ষত্রিয় সামন্তরাজ বাস করতেন, তাঁর নাম মল্লদেব। তাঁর যে দেশ, সেখানে বাইরের থেকে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল, বাইরের শত্রু শত-সহস্রবার হানা দিয়েও সেই কৃষ্ণকায় ভীষণ দানবের মত পাহাড়কে জয় ক'রে ভিতরে আসতে পারেনি। মল্লদেব নামেই সামন্তরাজ ছিলেন, সম্রাটের চেয়ে তাঁর প্রতাপ বেশী বই কম ছিল না। তাঁর শাসনাধীনে বাস করত যারা, তারা কোনওদিন কোনও বিষয়ে তাঁকে অতিক্রম করতে সাহস করত না। তাই ব'লে তিনি যে অত্যাচারী রাজা ছিলেন, তা নয়। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি হিংস্র পশুর মত ভয়ানক হয়ে উঠতেন বটে, কিন্তু তাঁকে মেনে চললে তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতেও কাতর হতেন না। পিতা যেমন যত্নে নিজের সন্তানকে রক্ষা করেন, সেই ভাবেই তিনি দেশের অধিবাসীদের রক্ষা করতেন।

তাঁর রাণী বিজয়াও ছিলেন তাঁর উপযুক্ত স্ত্রী। ক্ষত্রিয়ের মেয়ের যেমন হতে হয়, তিনি ঠিক তেমনিই ছিলেন। তাঁর মনে ভয়ের লেশও ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে স্নেহেরও অভাব ছিল না। যুদ্ধে বিগ্রহে স্বামীর পাশে ঘোড়ায় চ'ড়ে রণক্ষেত্রেও তাঁকে দেখা যেত, আবার দুঃখী-দরিদ্রের ঘরে মূর্তিমতী করুণার মত, অন্নপূর্ণার মতও তাঁকে দেখা যেত।

এক দুঃখ ছিল এঁদের। প্রকাণ্ড প্রাসাদ লোকজনে গম্‌গম্ করত, কিন্তু তার ভিতর শিশুর কাকলি কোনওদিন শোনা যেত না। বিজয়ার চোখে হাজার আলোয় আলোকিত ঘরগুলো আঁধার ঠেকত, তাঁর মন ছট্‌ফট্ করত—তাঁর দীনতম প্রজার কুঁড়ে ঘরে পালিয়ে যাবার জন্যে, তাদের ধুলোকাদা-মাখা খোকাখুকিগুলোকে নিয়ে খেলা করবার জন্যে। সন্তানলাভের আশায় তিনি কত ব্রত, কত উপবাস যে করতেন, কত তীর্থ-ভ্রমণ, কত দানধ্যান যে করতেন, তার আর গোণাগুণতি ছিল না।

মল্লদেবের রাজ্যের চারিদিকে নিবিড় বন, তার ভিতর ছিল এক দেবমন্দির। কতকালের পুরানো যে তা কেউ বলতে পারে না। আগে নাকি সে জায়গায় গ্রাম ছিল, কি একটা মহামারী হয়ে গ্রামের বেশীর ভাগ লোক মারা গেল, যারা বেঁচে ছিল, তারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে দূরে গিয়ে ঘর বাঁধল। কেবল দেবমন্দিরের পুরোহিত পালালেন না। দেবতা মৃত্যুভয়ের অতীত, তাঁর পূজারীরও ভয় পাওয়া সাজে না। তাই সেই গহন বনের ভিতর একলা রইলেন প'ড়ে পাষাণময় বিগ্রহ আর তাঁর সেবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গ্রামবাসীরা প্রথম প্রথম পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে মন্দিরে আসত, ক্রমে তাও ছেড়ে দিল। চারিদিকের বন গহন থেকে গহনতর হতে লাগল, হিংস্র জন্তুতে ভ'রে উঠল। পূজারী ব্রাহ্মণ কবে যে মারা গেলেন, তাঁর স্থান কে কি ভাবে পূর্ণ করল, সে খোঁজ নিতে কারও ভরসা হল না। বহুযুগ কেটে গিয়েছে, তবু এখনও কিন্তু সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টাধ্বনি গভীর বনের বক্ষভেদ ক'রে মানুষের কানে এসে পৌঁছায়।

পূর্ণিমার তিথি। সকাল থেকে রাণী বিজয়া স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে, রাজ্যের যত দীন-দুঃখীকে ভিক্ষা বিতরণ করছেন। প্রতি পূর্ণিমাতেই তিনি এরকম করেন। এই আশায় করেন যে এতে যদি দেবতা তুষ্ট হয়ে তাঁর কোলে একটি শিশু পাঠিয়ে দেন। সব ভিখারীরা চ'লে গেল, ব'সে রইল এক অন্ধ বৃদ্ধ। রাণী তাকে জিগ্‌গেস করলেন, "তুমি কি আর কিছু চাও?"

সে বল্লে, "কিছু না মা। কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, আপনি আর আমাদের মহারাজ যেন অরণ্য-ভৈরবের পূজা দিতে চ'লে গেলেন। ফিরে যখন এলেন, আপনার কোলে রাজপুত্র।" ব'লে বুড়ো উঠে চ'লে গেল।

রাণী বিজয়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্ধ বৃদ্ধ এ কি ব'লে গেল! এ কি শুধুই স্বপ্ন, না এর ভিতর সত্যও কিছু আছে? হবেও বা। হয়ত তার বাইরের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তরের দিব্য-দৃষ্টি লাভ

হয়েছে। অন্য মানুষের কাছে যা অজ্ঞেয়, সে হয়ত তা জানতে পারে।

…বসে রইল এক অন্ধ বৃদ্ধ। রাণী তাকে জিগ্‌গেস করলেন, "তুমি কি আর কিছু চাও?"

কিন্তু অরণ্য-ভৈরবের মন্দিরে যাওয়া, সে ত সহজ ব্যাপার নয়! মন্দিরের কাছে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে—এমন ত কোনও মানুষ রাণী দেখেন নি। তবু তাঁকে যেতে হবে। মহারাজ সঙ্গে থাকলে বিজয়ার সাক্ষাৎ যমপুরীতে যেতেও ভয় নেই।

মল্লদেব যখন অন্তঃপুরে এলেন, তখন বিজয়া তাঁকে সব কথা

বললেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "সে যে বড় ভয়ানক পথ, তুমি পারবে যেতে?"

বিজয়া বললেন, "তুমি সঙ্গে থাকলে পারব।"

সেই দিন থেকে অরণ্য-ভৈরবের মন্দিরে যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল। আয়োজন কিছু নিয়ে যাবার জন্যে নয়, যা রেখে যাচ্ছেন—তার সুব্যবস্থার জন্যে। যদিই তাঁরা না ফেরেন, বলা ত যায় না? যাবেন তাঁরা তীর্থ-যাত্রীর মত, রাজ-ঐশ্বর্য্যের ঘটা কিছু তার ভিতর থাকবে না।

দিন দশ-বারোর ভিতর তাঁদের সব কাজ চুকে গেল, তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ রইল না। রাজা পরলেন সাধারণ সৈনিকের বেশ, কারণ সশস্ত্র হয়ে যেতে হবে। রাণী চললেন সাধারণ গৃহস্থ-বধূর বেশে, হাতে একগাছি ক'রে সোনার কঙ্কণ ছাড়া আর কোন গহনাও তাঁর রইল না।

রাজ্যের অর্দ্ধেক লোক রাজারাণীকে বিদায় দেবার জন্যে বনের গোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। রাজারাণী যখন সেই অন্ধকার বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল।

সে কি ভীষণ বন! এ রকম জায়গা রাজা বা রাণী স্বপ্নেও কোনও-দিন দেখেন নি। বনের ভিতরকার আঁধার এমন গভীর, যে মনে হয় সৃষ্টির গোড়া থেকে সূর্য্যের আলোর একটি রেখাও কখনও এখানে প্রবেশ করেনি। সেখানকার নিস্তব্ধতা এমন অটুট, এমন ভয়াবহ, যে মনে হয় বাইরের জগতের হাওয়াও যেন এর মধ্যে ঢুকে গাছের পাতাটিতে নাড়া দিতে ভয় পায়। এই ভীষণ বনের ভিতর দিয়ে, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে, রাজা আর রাণী দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে চললেন।

বনের ভিতর পথের কোনও চিহ্ন নেই। অরণ্য-ভৈরবের মন্দির কতদূরে কে জানে। কতখানি যে বেলা হল, তাও বুঝবার কোনও

উপায় নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হয়ে, মল্লদেব আর বিজয়া একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

সামান্য কিছু খেয়ে ক্ষুধা-নিবৃত্তি ক'রে ও বিশ্রামে একটু সুস্থ হয়ে, তাঁরা আবার চলতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বনের ভিতরের আঁধার গাঢ় হয়ে উঠছে, এতক্ষণের নিরবতা ভেঙে গিয়ে চারিদিকে কিসের যেন একটা সাড়া জেগে উঠছে। রাজা বললেন, "এইবার সাবধান।"

কিন্তু এই ভীষণ অন্ধকারে বেশীক্ষণ আর চলা গেল না। রাজারাণী আবার গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন। চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ব'সে নিদ্রাহীন চক্ষে রাত্রি কাটিয়ে দিলেন। বিজয়া দু-একবার ঢুলে পড়লেন। কিন্তু মল্লদেবের চোখে এক নিমেষের জন্যও পলক পড়ল না।

ক্রমে আঁধার তরল হয়ে আসতে লাগল, তাঁরা বুঝলেন ভোর হচ্ছে। আগুন নিভিয়ে দিয়ে আবার এগিয়ে চললেন।

দ্বিতীয় দিনও প্রথম দিনের মত কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় মনে হল, অনেক দূরে কোথায় যেন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, ঘণ্টাধ্বনি যেন ভেসে আসছে; রাণী বিজয়ার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "ঐ বোধহয় অরণ্য-ভৈরবের মন্দির।"

রাজা বললেন, "তাই হবে, ভৈরবের বিশেষ কৃপায় আমরা এতদূর নিরাপদে এসেছি, নইলে কোনও মানুষ এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যায় বলে শুনিনি।"

কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তাঁদের বাধা দিল। আগের রাত্রির মত আজও তাঁদের জেগে ব'সে থাকতে হল। চারিদিকে আগুন জ্বলছে, যাতে কোনও বন্যজন্তু অতর্কিতে তাঁদের আক্রমণ না করতে পারে। কারা যেন সারি সারি হেঁটে চলেছে, তাদের কথার গুঞ্জন, মেয়েদের অলঙ্কারের শিঞ্জন, সব শোনা যাচ্ছে, খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। আস্তে আস্তে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার কারা

আসছে? তাদের পায়ের শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠছে, তাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, গভীর অরণ্যকে সজাগ ক'রে তুলেছে। কোথায় যাচ্ছে এরা, কোন্ দিগ্বিজয়ে? দেখতে দেখতে তাদের পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল, বন আবার নীরব নিঝুম।

ক্রমে অন্ধকার কেটে গেল, পূর্ব্বদিগন্তের বক্ষভেদ ক'রে সূর্য্যদেব আলোর প্লাবন ছুটিয়ে দিলেন। মল্লদেব আর বিজয়া উঠে পড়লেন। ঐ ত দেখা যায় অরণ্য-ভৈরবের মন্দিরের চূড়া। আশায় তাঁদের হৃদয় ভ'রে উঠল, তাঁরা মহোৎসাহে এগিয়ে চললেন।

ভৈরবের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে কত শতাব্দীর ঝড় বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য ক'রে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার কালো পাথরের দেওয়ালে কোথাও ফাট ধরেনি, কোথাও আগাছা জন্মায়নি। মন্দিরের চূড়ার উপর যে ত্রিশূল বসান, তার ইস্পাত এখনও ঝক্‌ঝক্ করছে। মন্দিরের বিশাল জোড়া-কপাট বন্ধ। রাজা ডেকে বললেন, "কে আছ, দরজা খোলো, আমরা তীর্থ-যাত্রী, পথশ্রমে বড় কাতর।"

প্রথমে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তারপর কে যে কপাট খুলল, তা তাঁরা দেখতে পেলেন না, কিন্তু দরজা আস্তে আস্তে দুফাঁক হয়ে তাঁদের ভিতরে যাবার পথ ক'রে দিল। মল্লদেব আর বিজয়া ভিতরে ঢুকলেন।

দেবতার চরণে উৎসর্গ করবার জন্যে তাঁরা কোনও অর্ঘ্য নিয়ে আসেননি, কিন্তু এমনি কি ক'রে প্রণাম করবেন? মল্লদেব কোমর-বন্ধ থেকে তাঁর ইস্পাতের ছোরাখানি খুলে দেবতার চরণে রেখে প্রণাম করলেন, রাণী হাতের একমাত্র অলঙ্কার সোনার কঙ্কণ খুলে দিলেন।

পূজো শেষ ক'রে তাঁরা মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরের দালানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বিজয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন, তিনি সেই শান-বাঁধান মেঝের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মল্লদেব খানিকক্ষণ জেগে থাকবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুই রাত না

ঘুমিয়ে তিনিও অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন, দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতে কোন এক সময় তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন।

একই সময়ে হঠাৎ কি ক'রে তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলেন, সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এসেছে, বনের ভিতর ছায়া গভীর হয়ে আসছে। রাজা ব'লে উঠলেন, "কি আশ্চর্য্য, আমরা এতক্ষণ ঘুমিয়েছি ?"

রাণী বললেন, "আমি কি সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম।"

রাজা বললেন, "স্বপ্ন ত আমিও দেখেছি, কিন্তু তুমি কি দেখেছ, আগে বল।"

বিজয়া বললেন, "আমি দেখলাম, দেবী পার্ব্বতী আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'দেবমূর্ত্তির পায়ের কাছে তাঁর প্রসাদী ফল পাবে, তাই নিয়ে যাও। শুকনো ফল যেদিন আবার সরস, সতেজ রূপ ধরবে, সেদিন, সেটিকে খেও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

মল্লদেব বললেন, "কি আশ্চর্য্য, আমিও ঠিক ঐ স্বপ্নই দেখেছি। শুধু আমার মাথার কাছে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি পার্ব্বতী নন, একজন সন্ন্যাসী। চল মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেখা যাক, স্বপ্নের ভিতর সত্য কিছু আছে কিনা।"

দু'জনে আস্তে আস্তে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। সত্যিই ত, দুটি ফল প'ড়ে রয়েছে, দেবমূর্ত্তির পায়ের কাছে। বিজয়া তাড়াতাড়ি সে দুটি তুলে নিলেন আঁচলে ক'রে।

আবার তাঁরা বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাজা বললেন, "আজ রাত যেমন করে হোক এখানে কাটাতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায় ?"

রাণী বললেন, "দুদিন এক-রকম না খেয়েই কেটেছে, আজও না-হয় তাই কাটবে। অরণ্য ভৈরবের প্রসাদী ফল দুটি এখন ত খাবার জো নেই, নইলে তাই দিয়েই আজ আমরা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করতাম।"

রাজা বললেন, "কবে যে শুকনো ফল আবার টাটকা হয়ে উঠবে,

তা ত কিছু বোঝা গেল না। আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে ?”

রাণী বললেন, “দেখাই যাক, এতটা করুণা যখন দেবতা আমাদের উপরে করেছেন, তখন অল্পের জন্যে অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। হয়ত আজ রাত্রে স্বপ্নে আবার আমরা তাঁর আদেশ পাব।”

রাজা রাণী মন্দিরের দালান থেকে নেমে চারিদিক ঘুরে দেখতে গেলেন, কোথাও ফল কি জল কিছু পাওয়া যায় কিনা।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েক পা যেতে না যেতেই তাঁরা সুন্দর একটি ঝরণা দেখতে পেলেন। অথচ কাল এই পথে মন্দিরে আসবার সময় এটি মোটেই তাঁদের চোখে পড়েনি। শুধু ঝরণা নয়, তার আশে পাশে গাছে কি চমৎকার গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা ফল ঝুলছে। রাজারাণীর মুখে আর কথা ফুটল না। নীরবে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তাঁরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি ক'রে মন্দিরে ফিরে এলেন। দেখতে দেখতে রাত্রির আঁচলের তলায় সমস্ত বন আড়াল হয়ে গেল। রাজা রাণী মন্দিরের ভিতরে ঢুকে, সকাল হবার আশায় ব'সে রইলেন।

খানিক ব'সে থাকার পর, এ রাত্রেও তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন আবার, দেবতা সন্ন্যাসীর রূপ ধ'রে বলছেন, 'যেদিন তোমরা সব চেয়ে বড় স্বার্থ ত্যাগ করবে, সেইদিন শুকনো ফল তাজা হয়ে উঠবে।'

পরদিন সকালে উঠে, পূজা শেষ ক'রে মল্লদেব আর বিজয়া নিজেদের রাজ্যে ফিরে চললেন। মন্দিরের পথে তাঁদের প্রাণ যে-রকম ভয় আর নিরাশায় পূর্ণ ছিল, এখন তেমনই আশায় আর আনন্দে ভ'রে উঠল। শীঘ্রই যে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, এ বিষয়ে তাঁদের আর কোনও সন্দেহ রইল না।

রাজারাণী দেশে ফিরতেই ঘরে ঘরে উৎসব সুরু হয়ে গেল। প্রজারা একেবারে শোকে নিরাশায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, মল্লদেব আর বিজয়াকে ফিরে পাবার আশা আর তাদের ছিল না। এখন রাজ-

প্রাসাদেও মহোৎসবের স্রোত বইতে লাগল। দান-ধ্যান, কাঙ্গালী-ভোজন—নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধন মল্লদেব দুহাতে বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

বিশাল রাজকোষ ক্রমে শূন্য হয়ে এল, কিন্তু মন্দির থেকে তাঁরা যে দুটি ফল নিয়ে এসেছিলেন, তা যেমন শুকনো তেমনই রইল। বিজয়া দুঃখিত হয়ে বললেন, "আর আমাদের কি আছে যে দেব? এততেও দেবতা সন্তুষ্ট হলেন না?"

মল্লদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখা যাক, একেবারে সর্ব্বস্ব দিয়েও দেবতাকে তুষ্ট করা যায় কি না। সামনের পূর্ণিমায় আমরা প্রাসাদের দ্বার সাধারণের কাছে খুলে দেব। সেদিন আমাদের অদেয় কিছুই থাকবে না। প্রাণও যদি কেউ চায়, তাও দিয়ে দিব। আশা করি, এইবার ভৈরব তুষ্ট হবেন।"

রাণী তাতেই রাজী হলেন। রাজ্যে তাঁদের কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। সকলে উৎসুক হয়ে কবে পূর্ণিমা আসে, তারই দিন গুণতে লাগল।

পূর্ণিমা এসে পড়ল। মল্লদেবের নিজের রাজ্যের শুধু নয়, আশে-পাশের রাজ্যের যত দীন দুঃখী প্রার্থীর দল এসে ভীড় করে দাঁড়াল। রাজা রাণী প্রাসাদের দরজা খুলে দিলেন, সবাইকে ডেকে বললেন, "যার যা নেবার ইচ্ছে, নিয়ে যাও; আজ আমাদের অদেয় কিছু নেই।"

ভিখারীর দল স্রোতের জলের মত প্রাসাদের ভিতর ঢুকে পড়ল, দুহাত ভ'রে ধনরত্ন নিয়ে যেতে লাগল, যাবার সময় প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে যেতে লাগল রাজারাণীকে। ক্রমে ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল, রাণীর বহুমূল্য অলঙ্কার, প্রাসাদের সুন্দর গৃহসজ্জাগুলিও এক এক ক'রে অন্তর্হিত হ'ল। রাজারাণী চেয়ে দেখলেন, তখনও দু'জন মানুষ ব'সে আছে,—আর সকলের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, তারা চ'লে গিয়েছে।

রাণী বৃদ্ধা ভিখারিণীকে ডেকে বললেন, "তুমি কি চাও বাছা? আমাদের আর কিছু ত দেবার নেই।"

বুড়ী নিজের বীভৎস ক্ষত-চিহ্নিত মুখ তুলে বললে, "রাণীমা, আমার রূপ নেই, তার দুঃখে আমি বড় কাতর। দেশের লোকে আমায় ঘেন্না করে। তাই আপনার দেবী-প্রতিমার মত যে রূপ, তাই আমি প্রার্থনা করতে এসেছি।"

রাজারাণী বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর রাণী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তাই হোক। কিন্তু রূপ কি ক'রে দেব বাছা? এ কি দেবার জিনিষ?"

বুড়ী খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁর কাছে এসে বল্‌লে, "আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলুন, 'আমার রূপ তোমার দেহে যাক, তোমার কুরূপ আমার দেহে আসুক'—তাহলেই হবে।"

রাণী অকম্পিত-হাতে বুড়ীর গায়ে হাত বুলিয়ে কথাগুলি ব'লে গেলেন। দেখতে দেখতে ভিখারিণীর কদর্য্যরূপ ঘুচে গেল। বিজয়ার অপূর্ব্ব-রূপরাশি তার অঙ্গে ফুটে উঠল. তার জরা আর কুরূপ বিজয়ার দেহে আশ্রয় নিল। ভিখারিণী হাসতে হাসতে আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে গেল।

তখন ভিখারী উঠে বল্‌লে "মহারাজ, আমি অক্ষম বলহীন। মানুষের সমাজে আমি হেয়। আপনার বল আর বীর্য্য আমি প্রার্থনা করি। আপনিও রাণীর মত ক'রে বল-বীর্য্য আমায় দান করুন।"

মল্লদেব বললেন, "তাই হোক।" ভিখারীর সর্ব্বাঙ্গে তিনি হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর অসাধারণ বল-বীর্য্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ত্যাগ ক'রে গেল। কুরূপ এবং হীনবল হয়ে রাজারাণী প্রাসাদের ভিতর ফিরে চ'লে গেলেন।

প্রাসাদের প্রকাণ্ড ঘরগুলো সব শূন্য খাঁ খাঁ করছে। কোথাও কিছু নেই। শুধু রাণীর পূজার ঘরে সেই ভৈরবের মন্দির থেকে আনা ফল দু'টি প'ড়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফল দু'টি ত আর শুক্‌নো

নেই? রসে রঙে সুগন্ধে ভরপূর হয়ে উঠেছে, সবে যেন বৃক্ষ-জননীব ক্রোড়চ্যুত হয়ে খ'সে পড়েছে।

রাণী বললেন, "আমাদের শেষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তবে দেবতাকে আমরা তুষ্ট করতে পেরেছি"—ব'লে ফলটি তুলে নিয়ে তিনি আহার করলেন। রাজাও তাই করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে প্রচার হয়ে গেল যে প্রাসাদে রাজশিশুর আবির্ভাব হবে। প্রজাদের ঘরে আনন্দকোলাহল বেধে গেল। রাজা-রাণী রূপ ও শক্তি-হীন হয়ে পড়ায় রাজ্যে যে দুঃখের আঁধার নেমে এসেছিল, তাও যেন হঠাৎ লুপ্ত হয়ে গেল।

ভোরের আলো সবে যখন রাত্রির অন্ধকারকে পৃথিবীর সীমানা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, সেই সময় জন্ম নিলেন রাজকুমার তিমির-বরণ। তাঁর গায়ের রঙ্ শাণিত ইস্পাতের মত, তাই তাঁর এ নাম হল।

রাজা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েই অবাক হয়ে গেলেন। কোথায় গেল তাঁর দুর্ব্বলতা আর অক্ষমতা? আগেকার সেই অমানুষিক বল-বীর্য্য এক নিমেষেই যেন তাঁব দেহে মনে ফিরে এল।

আবার সূতিকাঘরের দরজায় শাঁখ বেজে উঠল। রাজকুমারী জ্যোতির্লতা জন্ম নিয়েছেন, আর তাঁকে কোলে নিয়ে রাণী বিজয়া আনন্দে আর ফিরে পাওয়া রূপের প্রভায় শুক্লা পূর্ণিমার মত শোভা পাচ্ছেন।

অতি লোভ

(বিদেশী গল্প)

এক পাড়াগাঁয়ে পাশাপাশি দুই-ঘর গৃহস্থ বাস করে। একজন তাঁতি, সে বেচারা গরীব মানুষ, অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্টে দিন কাটায়। আর একজন মুদী, তার অবস্থা বেশ ভাল, ঘরে কিন্তু ছেলে-পিলে নেই। মুদী বড় কৃপণ, গরীব-দুঃখীকে এক-পয়সা দিতে কখনও তার হাত ওঠে না। তাঁতি যদিও তার তুলনায় অত্যন্ত গরীব, তবু তার মনটা ভাল, পারতপক্ষে তার দরজা থেকে গরীব-দুঃখী কখনও ফিরে যায় না।

পৌষ-পার্ব্বণের আগের রাত্রে মুদী-গিন্নি দরজায় খিল দিয়ে ব'সে ভাল ভাল পিঠে তৈরী করছে। দরজা বন্ধ করবার কারণ, যদি আশে-পাশের গরীব ছেলে-পিলে দেখতে পেয়ে দু-একখানা চেয়ে বসে? তাহ'লেই ত মুদী-গিন্নির সর্ব্বনাশ!

যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। পাটিসাপ্‌টার থালাটি বেশ ভর্ত্তি ক'রে মুদী-গিন্নি সবে উঠ্‌বে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল,—ঠক্-ঠক্-ঠক্।

মুদী-গিন্নি চ'টে, তাড়াতাড়ি পিঠের থালার উপর একটা ধামা চাপা দিয়ে, দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারল। দেখে খুন্‌খুনে এক বুড়ী, গায়ে সাততালি দেওয়া ময়লা কাঁথা, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হি হি ক'রে কাঁপছে।

মুদী-গিন্নি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, "তুই কি চাস রে? এখানে মরতে এসেছিস কেন?"

বুড়ী বললে, "সারাদিন কিছু খাইনি মা, রাতে বুড়ো-মানুষ চোখে দেখতে পাই না, আমাকে একটু জায়গা দেবে? শীতে হাড়-গোড় জ'মে যাচ্ছে।"

মুদী-গিন্নি বললে, "বেরো, বেরো, আমার আর কাজ নেই, রাজ্যের যত ভিখিরীকে ঘরে জায়গা দেব। যা না ঐ তাঁতির বাড়ী, তাদের সুখ্যাত মানুষে পাঁচ মুখে করে, সে তোকে জায়গা দেবে এখন"— ব'লেই দড়াম ক'রে বুড়ীর মুখের উপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, পিঠের থালা নিয়ে ঘরে গিয়ে বসল।

বুড়ী শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে চলল তাঁতির বাড়ী। তাঁতিনীও তখন চারটি চাল-গুঁড়ো দিয়ে, ছেলে-ভুলনো খান-কতক পিঠে করতে বসেছে। নইলে বোকা ছেলে-মেয়েরা ছাড়ে না যে। মা-বাবার নেই বললে ত তারা শুনবে না! কাজেই যেমন ক'রে হোক তাদের ভুলাতে হবে। তাই চাল-গুঁড়ো আর গুড় দিয়ে তাঁতি-বৌ পিঠে করছে। ছেলে-মেয়েরা পাশে ব'সে দেখছে।

এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল – ঠক্-ঠক্-ঠক্। তাঁতি-বৌ পিঠের কড়া নামিয়ে রেখে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। দেখে থুন্‌থুনে এক বুড়ী দাঁড়িয়ে, শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

দেখেই তাঁতিনীর দয়া হল, সে জিজ্ঞেস করলে, "কি চাও গা বাছা তুমি?"

বুড়ী বল্‌লে, "আমি দুদিন খাইনি মা, বুড়ো-মানুষ রাতে চোখে দেখি না, আমাকে একটু জায়গা দেবে?"

তাঁতিনী বললে, "তা এস বাছা, আমাদের যদিও একখানা মোটে ঘর, তবু এমন শীতের রাতে তোমাকে ত ফিরিয়ে দিতে পারি না। যা হোক দুমুঠো খেয়ে এইখানেই শুয়ে থাক।"

বুড়ী ভেতরে এসে দাঁড়াল। তাঁতিনী ভাঙা থালায় ক'রে খান-কয়েক পিঠে এনে তাকে খেতে দিল। ছেলে-মেয়েরাও তার চারধার ঘিরে পিঠে খেতে বসল। খাওয়া হয়ে গেলে সবাই সেই এক ঘরে ছেঁড়া মাদুর, কাঁথা, যে যা পেল, তাই পেতে শুয়ে পড়ল। বুড়িও তাদের সঙ্গে শুল।

ভোর রাত্রে বুড়ী উঠে পড়ল। তাঁতিনীকে জাগিয়ে বললে, "মা

আমি চললাম, তুমি ঘরে দোর দিয়ে শোও। তোমার মনটা বড় ভাল, তাই যাবার সময় বুড়ো মানুষ আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি। একটা কোনো ইচ্ছা কর, সে ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে।"

তাঁতি-বৌ ভেবেই পেলে না কি ইচ্ছা করবে। অনেকক্ষণ পরে তার মনে পড়ল যে আগের দিন তার স্বামী খুব একখানা বাহারের শাড়ী বুন্‌তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সুতোর অভাবে বেশীক্ষণ বুন্‌তে পারেনি। সকালবেলা একটুক্ষণ কাজ ক'রে, সারাদিন তাকে ব'সে থাকতে হয়েছিল। তাই সে বললে, "আচ্ছা মা, আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের ঘরে সকালবেলা যে কাজ আরম্ভ হবে, তা যেন সারাদিন চলতে থাকে।"

বুড়ী বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই হবে,"—ব'লে লাঠি ঠক্‌ঠক্ কর্‌তে কর্‌তে ভোরের কুয়াসার মধ্যে মিশিয়ে গেল।

সকাল বেলা উঠে তাঁতি গিয়ে তাঁতে বসল। ধার ক'রে অল্প একটু সুতো এনেছে যদি কাপড়খানা শেষ করতে পারে। তাঁতে হাত দিতেই তাঁত এমন জোরে চলতে আরম্ভ করল, যেন তার প্রাণ হয়েছে। কাপড় খানা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তাঁত আর থামবার নামও করে না। সেটা চলেছে খটাখট্, কাপড়ের পর কাপড় বোনা হয়ে চলেছে, আর প্রত্যেকটা আলাদা রকমের। তাঁতি ত একেবারে হতভম্ব, কি ব্যাপার বুঝতেই পারে না। অথচ তাঁতের সামনে থেকে উঠতেও পারে না। কাপড়ের পর কাপড় বেরচ্ছে, আর ঘরের কোণে জমা হচ্ছে। এমন নানা রং-এর এত সুন্দর সুন্দর কাপড় কেউ এ গাঁয়ে চোখেও দেখেনি। তাঁতি-বৌ আর ছেলে-মেয়েরা চারদিকে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে, এমন কাণ্ড তারা জন্মে দেখেনি।

শেষে ঘরে আর কাপড় ধরে না, দরজা দিয়ে কাপড় বেরিয়ে উঠানে পড়তে আরম্ভ করল। শেষে উঠানও ভরে গেল। তখন গ্রামের লোক খবর পেয়ে ভীড় ক'রে এসে দাঁড়াল, তারাও ত কাণ্ড দে'খে অবাক্।

রাত্রি পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলল, তারপর তাঁতটা নিজে থেকেই থেমে গেল। কাপড়ের গল্প মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর কাছেই যে সহর ছিল, সেখান থেকে কাপড়ের ব্যাপারীরা এসে সব কাপড় বেশ ভাল দামে কিনে নিয়ে গেল। তাঁতির দুঃখ চিরদিনের মত ঘুচে গেল, ছেলে-পিলে নিয়ে সে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

এদিকে সেই মুদী-বৌ ত ব্যাপার দে'খে কপাল চাপড়ে মরে আর কি। সে থাকতে লক্ষ্মীছাড়ী তাঁতি-বৌ কিনা এই রকম জিতে গেল? বুড়ীটা ত প্রথম মুদী-বৌএর ঘরেই এসেছিল, সে যদি বোকামী ক'রে তাকে তাড়িয়ে না দিত, তা হলে তার ঐশ্বর্য্য আজ খায় কে? মুদী তার দুঃখ দে'খে সান্ত্বনা দিতে লাগল, "অত দুঃখ ক'রে লাভ কি? যা হবার তাত হয়েই গেছে? আসচে বছর পিঠে-পার্ব্বণের দিনে আবার সে আসবে হয়ত, তখন একটু সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা কোয়ো।"

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। আবার পিঠে-পার্ব্বণের আগের রাতে মুদী-বৌ ব'সে পিঠে করছে, তার কান প'ড়ে আছে দরজার দিকে, কখন কে এসে দরজায় ঘা দেয়। সত্যি, খানিক পিঠে হয়ে যাবার পরেই দরজায় ঘা পড়ল—ঠক্-ঠক্-ঠক্।

মুদী-বৌ তাড়াতাড়িতে প্রায় পিঠের থালা উল্টে ফেলে ছুটল দরজা খুলতে। দেখে কাঁথা মুড়ি দিয়ে এক বুড়ো দাঁড়িয়ে, শাদা দাড়ি তার পা অবধি লুটিয়ে পড়ছে।

মুদী-বৌ খুব মিষ্টি ক'রে জিজ্ঞেস করলে, "হাঁ গা বাছা, তুমি কি চাও?"

বুড়ো বললে, "দু-তিন দিন কিছু খাইনি মা, আমাকে কিছু খেতে দেবে?"

মুদী-বৌ মহা খাতির ক'রে বুড়োকে বললে, "এস, এস, ভেতরে এস। দেব বৈকি খেতে, না হলে গেরস্তর ঘর আছে কি করতে?"

বুড়ো মহা আরামে আগুনের ধারে ব'সে পিঠে খেতে লাগল। মুদীও এসে পড়ল, দুজনের আদর-যত্নের ঘটা দেখে কে? বুড়ো খেয়ে দেয়ে চ'লে যেতে চায়, কিন্তু তারা তাকে জোর ক'রেই ধ'রে রাখল। সব চেয়ে ভাল ঘরে, ভাল বিছানা পেতে তারা বুড়োকে শুইয়ে রাখল।

ভোর রাত্রে বুড়ো উঠে মুদীর ঘরের দরজা ঠেলতে লাগল। মুদী আর তার বৌ দুজনেই জেগে ছিল, ধড়মড় ক'রে উঠে বেরিয়ে এল। বুড়ো বললে, "দেখ বাছা, আমি চললাম, আমার অনেক দূরের পথ যেতে হবে। তা তোমরা আমায় খুব আদর যত্ন করেছ, তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি। একটা কিছু ইচ্ছা কর, সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

মুদী কিছু বল্‌বার আগেই মুদী-বৌ ব'লে উঠল, "আমরা সকালে যে কাজ আরম্ভ করব, সারাদিন যেন সে কাজ চলতে থাকে।"

বুড়ো বললে, "আচ্ছা,"—ব'লে দরজা খুলে বেরিয়ে চ'লে গেল।

মুদী বললে, "আচ্ছা কি কাজ আরম্ভ করা যায়, বল দেখি?"

মুদী-বৌ বল্‌লে, "আমি সে সব ঠিক ক'রে রেখেছি। আমরা সকাল থেকে টাকা গুণব। দাঁড়াও ঐ চট ক'টা কেটে গোটা-কয়েক থলি তৈরী ক'রে রাখি, না হলে অত টাকা ধরবে কিসে?"

এই ব'লে সে কাঁচি নিয়ে ব্যস্ত-ভাবে চট কাটতে আরম্ভ ক'রল। মুদী আবার ফিরে গিয়ে বিছানায় শুল এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। মুদী-বৌ এত ব্যস্ত হয়ে চট কাটছে যে কখন সূর্য্য উঠে সকাল হয়ে গেছে, তা সে টেরও পায়নি।

হঠাৎ মুদী ধড়মড়িয়ে উঠে বললে, "আরে আরে, করছিস কি? সকাল যে হয়ে গেছে? টাকা গুণতে আরম্ভ কর্‌বি কখন?"

আর তখন কে টাকা গোণে? মুদী-বৌ কাঁচি দিয়ে কাপড় কেটেই চলেছে, কেটেই চলেছে। চট কখন শেষ হয়ে গেছে, সে এখন নিজের শাড়ীগুলো কচাকচ্‌ ক'রে কাটছে। তারপর মুদীর কাপড়, তারপর

বিছানা, বালিশ, তোষক, লেপ, কম্বল, পরদা—সব একে একে কেটে শেষ করতে লাগল। কেউ আর কিছুতেই তাকে থামাতে পারে না। ঘর-দোরের সব জিনিস যখন নির্ম্মূল হয়ে গেল, তখন সূর্য্য ডুবে অন্ধকার

মুদী-বৌ কাঁচি দিয়ে কাপড় কেটেই চলেছে, কেটেই চলেছে।

হয়ে গেছে। মুদী-বৌয়ের হাতের কাঁচি তখন থামল। গাদা করা কাটা কাপড়ের মধ্যে ব'সে তারা স্বামী-স্ত্রীতে মাথা চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

কুঁড়ে শামুক

(বিদেশী গল্প)

এক গাঁয়ে এক পেটুক ছিল, তার নাম শ্যাম। গাঁয়ের লোকে তাকে শামু ব'লে ডাকত। শামু নামটা শেষে শামুক হয়ে দাঁড়াল, কারণ পেটুকটা হাঁটত অত্যন্ত আস্তে আস্তে।

শামুকই যে একলা পেটুক ছিল তা নয়, তার বৌটিও খুব খেতে ভালবাসত, তবে সব জিনিষে তার রুচি ছিল না। ঝাল-চচ্চড়ি খেতে পেলে সে বেজায় খুশি। শামুক ত বেজায় কুঁড়ে, তাকে দিয়ে খাওয়া ছাড়া কোনও কাজই হয় না, সুতরাং রোজ রোজ ভাল জিনিষ খেতে তারা পাবে কোথায়? শামুকের বৌ সারা সপ্তাহ সুতো কাটে, শামুক সেই সুতো হাটের দিন হাটে নিয়ে যায়, তা বিক্রী ক'রে যা পায়, তাতেই তাদের সাতদিন চলে। হাট থেকে পয়সা নিয়ে ফিরবার পথে, শামু আর কিছু কিনুক আর নাই কিনুক, ঝাল-চচ্চড়ি রাঁধবার তরকারিটা ঠিক নিয়ে যায়, নইলে স্ত্রীর হাতে আর রক্ষা থাকবে না।

একদিন হাটে সুতোগুলো বেশ চড়া দামে বিক্রী হ'ল। শামু মহা খুশি, ভাবলে পথে যেতে যেতে কোনও একটা মিঠাইয়ের দোকানে কিছু মিঠাই খেয়ে যাওয়া যাবে। হাতে ত পয়সা আছে, বৌ-এর চচ্চড়ির তরকারি কিনেও কিছু বাকি থাকবে। বাড়ী ফিরবার পথেই বেশ বড় একটা ময়রার দোকান, শামু সোজা গিয়ে তার ভিতর ঢুকল। একবার খেতে আরম্ভ ক'রেই সে দুনিয়ার সব কথা ভুলে গেল। ক্রমাগত খেয়েই চলল, চারদিকে যত সুন্দর সুন্দর খাবার দেখে, তত তার ক্ষিদে বেড়ে যায়।

শেষে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে দেখে ময়রা বললে, "কি হে শামুক, একটানা খেয়ে চলেছ যে? পয়সা আছে ত ট্যাঁকে?"

শামু দাম দেবার জন্যে ট্যাঁক থেকে পয়সাগুলি বার করল। কিন্তু

দাম চুকিয়ে দিতে গিয়ে দেখে, প্রায় সবই শেষ হয়ে গেল, বাকি মাত্র ছ'টা পয়সা। সে খেয়েছে কি কম? ময়রা পয়সা গুণে নিয়ে বললে, "এইবার কেটে পড় বাপধন, রাত হয়ে এসেছে।"

শামু বাইরে বেরিয়ে এল। তার মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়েছে। মাত্র ত ছ'টা পয়সা হাতে, সারা সপ্তাহ খাবে কি দিয়ে? বৌ-এর জন্যে যদি ঝাল-চচ্চড়ির তরকারিও নিয়ে যেতে পারত ত বৌ না-হয় একটু ভাল মেজাজে থাকত। এখন শামু ছ'পয়সা নিয়ে ঘরে ঢুকলেই ত সে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে।

খানিক দূর এগিয়ে শামু দেখল, রাস্তার ধারে আরো একটা ছোট মিঠাইয়ের দোকান। এত যে খেয়েছে, তবু শামুর লোভ যায় নি। সে ভাবলে এ ছ'টা পয়সা থাকলেই কি আর গেলেই কি; বৌ-এর কাছে সমানই বকুনি খাব। তার চেয়ে আরও গোটা-কয়েক মিঠাই খেয়ে নিই। যেমন ভাবা, তেমনই দোকানে ঢোকা। দেখতে দেখতে সেই ছ'টি পয়সাও দোকানীর পকেটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শামুর তখন সত্যি সত্যি ভাবনা হ'ল। এখন সে বাড়ি ফিরবে কোন্ মুখে? স্ত্রীর মূর্ত্তি মনে ক'রে তার বেজায় ভয় করতে লাগল। শেষকালে কি মার খেয়ে মরবে? দোকানের বাইরে একটা গাছতলায় ব'সে সে ক্রমাগতই ভেবে চলল, কি ক'রে আবার কিছু পয়সা রোজগার করা যায়। পয়সা না নিয়ে যে ফেরা যাবে না, সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। ভাবতে ভাবতে গাছতলাতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর বেলা ময়রা যখন দোকান খুলছে, তখনও শামুকে দে'খে অবাক হয়ে গেল। বললে, "কিহে শামুক, সত্যিই শামুক হয়েছ নাকি? সারারাত ধরে ঐটুকু গিয়েছ?"

শামু বললে, "আমি বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই, কিছু পয়সা না নিয়ে যদি বাড়ি যাই, তা হলে মার খেয়ে মরব। কি ক'রে পয়সা উপার্জ্জন করা যায় বলতে পার?"

দোকানী বললে, "এক কাজ কর, পাশের গাঁয়ের জমিদার-গিন্নীর

একটা হীরার আংটি হারিয়ে গেছে, কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। তারা বলেছে, যে সেই আংটি খুঁজে দেবে তাকেই তারা একশ' টাকা দেবে। তুমি গিয়ে আংটিটা খুঁজে দেখ না, যদি কপাল-গুণে পেয়ে যাও ত কোনো ভাবনাই থাকে না।"

শামু ভাবলে, "মন্দ নয় ত, একটু খুঁজে দেখাই যাক না, যদিই পেয়ে যাই,"—এই ভেবে সে গুটি গুটি পাশের গাঁয়ের রাস্তা ধরল।

জমিদার-বাড়ি পৌঁছে সে বললে যে সে একজন মস্ত যাদুকর, মন্ত্রের বলে সে যা খুশি তাই করতে পারে। জমিদার বা তাঁর গিন্নী যে শামুর কথা বিশেষ বিশ্বাস করলেন তা নয়, তবু চেষ্টা করতে ত ক্ষতি নেই। তাই জমিদার-গিন্নী বললেন, "বেশ ত খুঁজে দেখ না? মন্ত্রের জোরে যদি আংটিটা বার করতে পার, একশ' কেন, তোমায় দেড়শ' টাকা দেব। কিন্তু তিন দিনের ভেতরে না যদি পার, তাহলে তোমায় মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদায় ক'রে দেব।"

শামু ত আদাজল খেয়ে আংটি খুঁজতে লেগে গেল। প্রথমে সে সুরু করল বাগানটা খুঁজতে,—প্রত্যেক গাছতলা, গর্ত্ত, পাতার গাদা সব উল্টে পাল্টে কতবার যে সে দেখল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পিঁপড়ের গর্ত্তগুলি শুদ্ধ সে মাটিতে উপুড় হয়ে প'ড়ে খুজে দেখল।

শামু ত বাগান খুঁজছে, এমন সময়ে দেখল যে বাগানের এক কোণে জমিদার বাড়ির তিনটে চাকর দাঁড়িয়ে কি সব ফিস ফিস করে বলাবলি করছে। শামুর তাদের দে'খে লজ্জাও হ'ল, রাগও হ'ল; সে ভাবলে, "আমি কি রকম শুধু শুধু হয়রান হচ্ছি তাই দেখবার জন্যে বেটারা দাঁড়িয়ে আছে।" এই না মনে ক'রে, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকাতে তাকাতে সেখান ছেড়ে চ'লে গেল।

সে চ'লে যেতেই চাকরদের ভিতর একজন আর একজনকে বললে, "আরে এটা সত্যিই যাদু জানে নাকি? আমাদের দিকে কি রকম ক'রে তাকাচ্ছে দেখ? কে আংটি নিয়েছে সত্যিই বুঝতে পেরেছে নাকি?"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার-গিন্নী শামুকে ডেকে বললেন, “কি, তুমি খোঁজ পেলে কিছু ?”

শামু বললে, “এখনও পাইনি।”

প্রথমে সে সুরু করল বাগানটা খুঁজতে—

জমিদার-গিন্নী বিরক্ত হয়ে একটা চাকরকে ডেকে বললেন, “একে শোবার জায়গা দেখিয়ে দাও গিয়ে।”

চাকরটা চলল তার সঙ্গে। শোবার ঘরে গিয়েই শামু ধপ্ করে বিছানায় ব’সে পড়ল, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, “হায়, হায়, তিনটের একটা ত গেল!” অর্থাৎ তিন দিনের একটা দিন চ’লে গেল।

চাকরটা ঠিক সেই সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে শামুর কথা শুনে বেজায় ভড়কে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। নিজের সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বলল, "ও ভাই সর্ব্বনাশ হয়েছে, লক্ষ্মীছাড়া যাদুকরটা সব জেনে ফেলেছে। আমায় দেখে বললে কিনা, 'হায়, হায়, তিনটের একটা ত গেল।'"

এই তিনজন চাকর মিলেই গিন্নীর আংটিটা চুরি করেছিল। কাজেই তারা এখন থেকে খুব সাবধান হয়ে শামুর চলা-ফেরা লক্ষ্য করতে লাগল।

দ্বিতীয় দিন শামু জমিদার বাড়ির আনাচ্ কানাচ্ ঘর দোর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, ঘোড়ার আস্তাবল সব খুঁজে দেখল। কিন্তু আংটি কোথাও পাওয়া গেল না। সেদিনও জমিদার-গিন্নী শামুকে ডেকে আংটির খবর নিলেন, তারপর একটা চাকরকে ডেকে তাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিতে বললেন। শামুর মনটা আজকে আরো খারাপ ছিল, কারণ দুটো দিনই বৃথায় চলে গেল, আর একদিন মাত্র বাকি। এরপর তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া হবে। সে খাটে ব'সেই বললে, "হায় রে কপাল, আর একটাও ত চলল।"

দ্বিতীয় চাকরটা এই কথা শুনবামাত্র প্রাণপণে ছুট দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললে, "ভাই রে, আমাদের হয়ে এসেছে। ও সবই জানতে পেরেছে, কালই বোধ হয় গিন্নীমাকে ব'লে দেবে। আমাদের কি হবে?"

অনেকক্ষণ পরামর্শ করে তারা ঠিক করল যে শামুকে সব খুলেই বলা হবে। তাকে অনুনয় বিনয় ক'রে দেখতে হবে যাতে সে জমিদার-গিন্নীকে কিছু না বলে। চাকররা চুরি-টুরি ক'রে যে টাকা জমিয়েছে, তার থেকেও খানিকটা শামুকে দেওয়া হবে ব'লে তারা স্থির করল।

তার পরদিন টাকাকড়ি দিয়ে শামুকে খানিক ঠাণ্ডা ক'রে, তারা আস্তে আস্তে হীরার আংটিটা বার ক'রে শামুর হাতে দিল। অনেক

ক'রে তার হাতে পায়ে ধ'রে ব'লে দিল যে তাদের নাম যেন কারও কাছে বলা না হয়।

শামু খুব গম্ভীর মুখ ক'রে বললে, "দেখলে ত বাবা, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আচ্ছা, তোমরা যখন এত ক'রে বলছ, তখন এবার আর আমি কথাটা ফাঁশ করবো না, কিন্তু ফের যদি এমন কর্ম্ম কর ত দেখতে পাবে।"

শামু তারপর ভাবতে বসল কি উপায়ে আংটিটা ফেরৎ দেওয়া যায়। সোজাসুজি দিতে গেলে নিজেকেই মুস্কিলে পড়তে হবে, কোথায় পেল, কি বৃত্তান্ত, সব গুছিয়ে বলা শক্ত হবে। তার চেয়ে একটা ফন্দী করা যাক।

সে এক দলা ভাতের ভিতর আংটিটা লুকিয়ে পুকুর ধারে চলল। এক পাল হাঁস পুকুর পাড়ের কাদায় ঘোরা-ঘুরি করছিল। তাদের একটার সামনে ভাতের দলাটা ফেল্‌বামাত্র সে সেটা টপ্‌ ক'রে গিলে নিল।

ঘণ্টা-খানিক পরে শামু গিয়ে জমিদার-গিন্নার কাছে হাজির। বললে, "গিন্নীমা, আপনি অনর্থক চাকরবাকরদের সন্দেহ করছিলেন। আসল চোর যে সে ধরা পড়েছে।"

জমিদার-গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কৈ, কোথায় সে?"

শামু গিয়ে হাঁসটাকে ধ'রে নিয়ে এসে বল্‌লে, "এর পেটে পাবেন, আমি মন্ত্র-বলে জানতে পেরেছি।"

হাঁসটা মারবার পর যখন সত্যি সত্যিই তার পেট থেকে আংটিটা বেরল, তখন শামুর খাতির দেখে কে?

কিন্তু শামু বেচারার অদৃষ্টে তখনও ভোগ ছিল। জমিদার-গিন্নীর ধারণা হ'ল যে শামু নিশ্চয়ই একটা কিছু ফন্দী খাটিয়েছে, আসলে মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই সে জানে না। তাকে আর একবার পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি বললেন, "আমি তোমার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমাদের আর একটা কিছু দেখাও।"

শামুর মাথায় ত আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কি আর করে, মুখে বললে, "যে আজ্ঞে, আপনি যা দেখাতে বলবেন তাই দেখাব।"

জমিদার গিন্নী উঠে নিজের ঘরে গেলেন, তারপর খানিক বাদে শামুকে ডেকে পাঠালেন। শামু গিয়ে দেখে, তিনি একখানা রেকাবীর উপর আর একখানা রেকাবী চাপা দিয়ে রেখেছেন। আর ঘর ভর্ত্তি লোক হাঁ করে সেটার দিকে চেয়ে আছে।

শামু যেতেই জমিদার-গিন্নী বললেন, "দেখ, তোমায় বলতে হবে এই রেকাবী-দুটোর মাঝখানে কি আছে। যদি ঠিক বলতে পার, তাহলে দেড় শ' টাকার উপরে আরো পঞ্চাশ টাকা তোমায় দেওয়া হবে, আর যদি না পার, তাহলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তোমাকে এখান থেকে বার ক'রে দেওয়া হবে।"

শামু ত মহা ফাঁপরে পড়ল। সে খানিকক্ষণ একেবারে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কত কিছু যে ভাবল তার ঠিক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস করল না। একবার যদি ভুল বলে, তাহ'লে আর সে ভুল শোধরাবার সুযোগ পাবে না।

একবার ভাবল, প্রাণপণে চোঁ চাঁ দৌড় দেবে, কিন্তু বাড়ি গেলেও ত ঝাঁটা খেতে হবে। কি যে করা যায়?

অবশেষে হতাশ হয়ে সে ব'লে উঠল, "হায় রে শামুক, তোর দশা কি হল।"

জমিদার-গিন্নী তৎক্ষণাৎ হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলেন, "কি আশ্চর্য্য! তোমার ক্ষমতা সত্যিই অসাধারণ!"

রেকাবীটা তুলবামাত্র দেখা গেল, তার ভিতর একটা শামুক ম'রে প'ড়ে রয়েছে।

তখন আর শামুকে পায় কে? জমিদার-গিন্নীর কাছে দু'শ টাকা নিয়ে সে ত নাচতে নাচতে বাড়ি চ'লে গেল।

তারপর তার বৌ দিনে পাঁচবার করে ঝাল-চচ্চড়ি খেতে লাগল, আর শামু মিঠাই খেয়ে খেয়ে প্রায় অসুখ বাধিয়ে বসবার যোগাড়।

পেটুক ভজু

বাংলাদেশের এক গৃহস্থের ঘরে একটিও ছেলে নেই। তার গোলা ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, বাগানভরা ফল, তরকারি। কিন্তু খাবার লোকই নেই। গৃহস্থ আর তার বউ, কতই আর খাবে? মনের দুঃখে তারা কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ নদীর জলে ঢেলে দেয়। রাশি রাশি ফল পাড়ার ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে দেয়। তারপর খালি মাথা চাপড়ায় আর কাঁদে, "একটা যেমন তেমন বোকা হাবা ছেলেও যদি হ'ত। ঘরে বসে ঘরের জিনিষ খেত, দুটো চোখ একটু জুড়োত।"

মানুষ যা চায়, ভগবান্ কখনও কখনও তাকে ঠিক তাই দিয়ে বসেন। এতকাল ছেলে-পিলে কিছুই ছিল না, হঠাৎ গৃহস্থের বউয়ের এক ছেলে হ'ল। আনন্দে তারা ত একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল, ছেলে নিয়ে কি যে করবে কিছু ভেবে পায় না।

কিন্তু এ আনন্দ তাদের বেশী দিন রইল না! ছেলে ত নয়, ঠিক রাক্ষস। এমন ভয়ানক সে খেতে লাগল যে তার বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন সব বিষম ভড়কে গেল। হাঁটতে শিখবার আগেই তাদের ছেলে ভজু হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বড় এক এক কড়া দুধ চুমুক দিয়ে শেষ ক'রে রাখত। প্রথম দিন কেউ বিশ্বাস করল না, বাড়ির হুলো বেরালটা শুধু শুধু মার খেয়ে মরল।

কিন্তু একদিন গৃহস্থ রান্নাঘরের জান্‌লার পাশে লুকিয়ে রইল। ভজুর মা ভাঁড়ার ঘরে ব'সে তরকারি কুটছে, ভজু হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে, মাঝের দরজাটা খোলা। মা অন্যমনস্ক হয়ে আলু ছাড়িয়ে যাচ্ছে, খোকা কখন হামা দিতে দিতে টুক্ ক'রে চৌকাট পার হয়ে গেল। কড়াভরা দুধ জ্বাল দেওয়া রয়েছে, তার পাশে গিয়ে চুমুক দিতে লাগল। চোঁ চোঁ চোঁ—কড়া প্রায় খালি হয়ে এসেছে, এমন সময় ভজুর বাবা ছুটে এসে ছেলের পিঠে এক চড় বসিয়ে দিল।

ছেলে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠতেই, তার মা বঁটি ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে রান্না-ঘরে ছুটে এল। স্বামীকে তাড়া দিয়ে বললে, "তুমি কি ক্ষেপেছ? এইটুকু ছেলেকে ধ'রে মারছ কেন?"
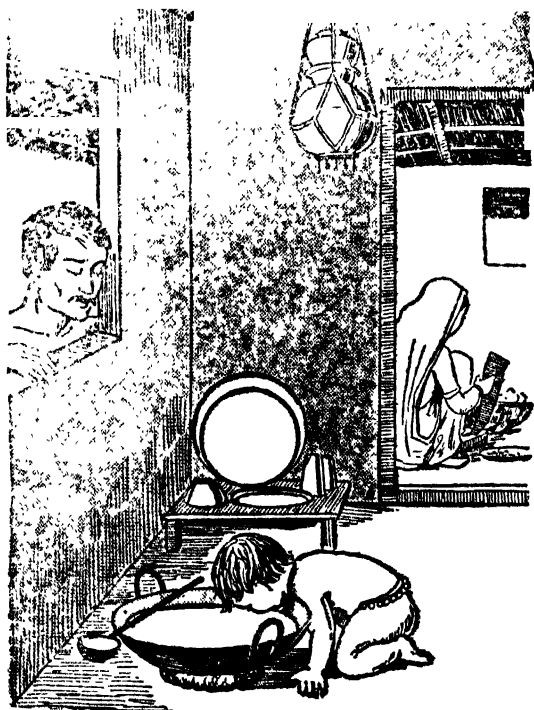
চো-চো-চো—কড়া প্রায় খালি হয়ে এসেছে—

ভজুর বাবা বললে, "আমি ত মাত্র একটা চড় মেরেছি, এর পর দেশশুদ্ধ লোক ওকে বাঁশ-পেটা করবে। এখনই এক কড়া দুধ শেষ করল, এরপর ও মানুষ ধ'রে খাবে। ওকি মানুষ, ও রাক্ষস।"

ভজুর মা ছেলেকে কোলে নিয়ে বকতে বকতে চ'লে গেল। একটা ত মোটে ছেলে, না-হয় এক কড়া দুধই খেয়েছে। আগে ত দুধ জলে ফেলে দেওয়া হত। ঘরের ছেলে খেলে ত খুসী হওয়ারই কথা।

কিন্তু ভজু বেচারার অদৃষ্টে এত আদর সইল না। সে চার বছরের হতে না হতে তার মা গেল ম'রে। কিছু দিন পরেই তার বাবা আর একবার বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এল।

সৎমা কোনও দিন ভাল হয় না, ভজুর সৎমাও হল না। সে এসেই কোথায় কি জিনিষ বেশী খরচ হচ্ছে, কোথায় কি নষ্ট হচ্ছে, সব গোছাতে ব'সে গেল। সৎমা ভজুকে খুব মেপে-জুখে খেতে দিতে লাগল। ভজু সাধারণ ছেলে-মেয়ের চেয়ে পনেরো-কুড়িগুণ বেশী সচরাচর খেত, কাজেই এই অবস্থায় তার দুর্গতির সীমা রইল না। ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে সমস্ত দিনরাত চীৎকার করত। পাড়া-পড়শী সকলে "রাক্ষস ছেলে" ব'লে গাল দিতে লাগল এবং বাপ উত্ত্যক্ত হয়ে ক্রমাগত দিতে লাগল কানমলার উপর কানমলা।

কানমলায় ত আর পেট ভরে না? কাজেই বাধ্য হয়ে ভজুকে চুরি ধরতে হ'ল। ঘরে ধরা পড়লেই, তার সৎমা ঝাঁটা-পেটা করত, বাইরে ধরা পড়লে সেখানেও মার। সৎমার ক্রমে দুই-তিনটি ছেলে-মেয়ে হওয়াতে ভজুর উপর অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। বনের ফল, শাকপাতা যা পায় তাই খেয়ে পেটের আগুন নিভায়। তাকে কেউ লেখাপড়াও শেখাল না, কাজকর্ম্মও শেখাল না। তার একমাত্র বিদ্যে হ'ল খাওয়া, কিন্তু সে খাওয়া যে কোথা থেকে জোটে তার ঠিকানা নেই। গ্রামে যখন কোনও বাড়িতে বিয়ে কি শ্রাদ্ধ থাকত, তখনই যা এক ভজুর কপাল খুলত। পেট ভ'রে খেতে ত সে পেতই, তার উপর অনেকে তার খাওয়ার বহর দেখে খুশি হয়ে দু'চার আনা ক'রে বখ্‌শিশ্‌ দিত। তবে এমন সুদিন বেশী ঘন ঘন আসত না।

কিন্তু তার পোড়া অদৃষ্টে এ সুখও বেশী দিন সইল না। তার বাপও মারা গেল। সৎমা তখন চেলাকাঠ নিয়ে ভজুকে তাড়া ক'রে বাড়ির বার করে দিল। গ্রামে কেউ তাকে জায়গা দিল না, অমন হাতীর খোরাক জোটাবে কে? কাজেই বেচারা ভজুকে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল।

সে চলতেই লাগল। কোথাও ভিক্ষে ক'রে খায়, কোথাও কুড়িয়ে খায়। যেখানে কিছু না জোটে, যেখানে শাকপাতা তুলে খায়। এই রকম ক'রে মাসের পর মাস চলতে চলতে সে মস্ত বড় এক সহরে এসে উপস্থিত হ'ল। নূতন জায়গা, কাজেই প্রথম প্রথম তার খাওয়ার কষ্ট হ'ল না। তামাশা দেখবার জন্যে অনেকেই তাকে ডেকে খেতে দিল।

......এমন সময় ভীড়ের ভেতর থেকে একজন লোক ছুটে এসে তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

একদিন ঠিক বাজারের মাঝখানে সে খেতে ব'সে গিয়েছে, এমন সময় ভীড়ের ভেতর থেকে একজন লোক ছুটে এসে তার হাত ধ'রে দাঁড় করিয়ে দিল। ভজু ত হাঁউ-মাঁউ ক'রে কেঁদে উঠল! তার পাতে

তখনও রাশীকৃত ডাল-ভাত মাখা, সে-সব শেষ না ক'রে নড়া যায় ? সে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, "আমি না খেয়ে যাব না. তোমরা আমাকে ধোরো না।"

যে লোকটি তাকে ধ'রে দাঁড় করিয়েছিলেন, তাঁর বেশ জমকালো পোষাক। তিনি বললেন, "তুমি কেঁদো না হে ছোক্‌রা, আমার সঙ্গে এস, তোমার খাওয়ার বেশ ভাল ব্যবস্থা করব। তুমি কোথা থেকে আসছ ?"

ভজু বললে, "আমি অনেক দূরের গাঁ থেকে আসছি। আমার মা-বাবা নেই। সৎমা ভয়ানক মারে, তাই আমি পালিয়ে এসেছি।"

সে লোকটি সেই দেশের একজন রাজকর্ম্মচারী। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "বেশ, বেশ, ঠিক তোমার মত একজন ছেলেই আমরা খুঁজছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে রাজবাড়িতে চল। বেশ ভাল কাজ পাবে।"

ভজু ডাল-ভাতের রাশের দিকে চেয়ে বললে, "আগে খেয়ে নিই, তারপর যাব।"

রাজকর্ম্মচারী বললেন, "এ ছাই ডাল-ভাতের জন্যে দেরি ক'রে কি হবে ? তুমি চল আমার সঙ্গে, পেট ভ'রে লুচি মিঠাই খেতে পাবে।"

লুচি মিঠাইয়ের নাম শুনে ভজু আর দেরি না ক'রে তাড়াতাড়ি গট্ গট্ ক'রে হেঁটে এগিয়ে চলল।

এদেশের রাজার দুই রাণী। বড়-রাণীর দুই ছেলে, ছোট-রাণীর শুধু একটি মেয়ে। তিনি বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেদের দুই চক্ষে দেখতে পারেন না। কি ক'রে তাঁদের পথ থেকে সরাবেন, এই খালি তাঁর চেষ্টা। রাজাও ছোট-রাণীর কথামত চলেন, কাজেই বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেদের উপর নানারকম অত্যাচার চলে। ছোট-রাণীর প্রতাপ বেড়েই চলেছে। এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বড়-রাণীর মহলে ঝি-চাকর শুদ্ধ কাজ করতে ভরসা পায় না। দু-চারজন অনেককালের বুড়ো ঝি-চাকর ছাড়া আর সবাই পালিয়েছে। ভয়ে

তাঁদের কাছে কোনও ছেলে-মেয়েও যায় না। একলা থেকে থেকে তাঁরা বড় মুষ্‌ড়ে পড়েছেন। দু-চারজন রাজকর্ম্মচারী ভেতরে ভেতরে বড়-রাণীকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাণী তাঁদের প্রায়ই অনুরোধ করতেন, ছেলেদের জন্যে একটি ছোকরা চাকর এনে দিতে। সে শুধু ছেলেদের সঙ্গে গল্প করবে আর খেলবে। ছেলেদের যত হাসাতে পারে, ততই ভাল। কিন্তু এরকম চাকর কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। সহরের কোনও লোক রাজবাড়িতে কাজ করবার জন্যে ছেলে দিতে চাইত না। আজ তাই পথের মাঝখানে ভজুকে পেয়ে রাজকর্ম্মচারীটি ভারি খুসি হয়ে গেলেন। এ ছেলে মানুষকে না হাসিয়ে যায় না। এর পেটটা দেখলেই ত অতি বড় গম্ভীর মানুষেরও হাসি আসে।

রাজকর্ম্মচারী ভজুকে বড়-রাণীর মহলে রাজকুমারদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "দেখ ভজু, তুমি এই রাজকুমারদের সঙ্গে খেলবে, আর তাঁদের খুব হাসাবে। এইটা যদি করতে পার, তাহলে যত খেতে চাও, পাবে।"

এইবার ভজুর দিনগুলি বেশ কাটতে লাগল। তাকে খেতে বসিয়ে মজা দেখা হল রাজকুমারদের এক কাজ। বলা বাহুল্য, এতে ভজুর কোনও আপত্তি ছিল না। খেয়ে খেয়ে পেটটি এমন ঢাকাই-জালার মত হয়ে উঠল যে লোকে তাকে দেখলেই হেসে মরে।

কিন্তু ভজুর কপাল যে ভাল নয়, তা তোমরা আগেই বুঝতে পেরেছ। রাজার হঠাৎ অসুখ করল। ছোট-রাণী ভাবলেন, রাজা যদি মারাই যান, তাহলে ত বড়-রাণীর ছেলে হবে রাজা, তিনি আর তাঁর মেয়ে পথে দাঁড়াবেন। সুতরাং এখন সাবধান হওয়া ভাল। রাজা ত বিছানায় প'ড়ে; ছোট-রাণী একখানা কাগজে তাঁর সই নিয়ে, বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেদের বন্দী করবার আদেশপত্র বের ক'রে ফেললেন। বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেরা বন্দী হলেন। শহরের বাইরে পুরনো এক দুর্গ ছিল, জঙ্গল দিয়ে ঘেরা; সেইখানে তাঁদের নিয়ে রাখা হল। ঝি-চাকরেরা খালি বাড়িতে ব'সে কান্নাকাটি করতে লাগল।

সব চেয়ে জোরে চেঁচাতে লাগল ভজু, কারণ তার এত সাধের খাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

দু-তিনদিন কান্নাকাটি ক'রে যখন কোনও লাভ হল না, তখন ঝি-চাকরেরা যে যার পথ দেখ্‌ল। ভজু আর কোথায় যাবে? সে লোককে জিগ্‌গেস কর্‌তে কর্‌তে সেই পুরনো দুর্গটার কাছে গিয়ে হাজির হল। কোনও গতিকে যদি ভেতরে ঢুকতে পারে, তা হলে খাওয়ার ভাবনাটা যায়।

দুর্গের চারদিকে ত কড়া পাহারা, কেউ ভেতরে যেতে পায় না। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরে বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেরা আছেন, সেই ঘর ছেড়ে তাঁরা বাইরে যেতে পারেন না। শহরের সব লোক 'হায় হায়' করছে, বড়-রাণী আর রাজকুমারেরা কি বেঁচে আছেন? রাক্ষসী ছোট-রাণী হয়ত তলে তলে তাঁদের মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছেন। যে-সব সৈন্যেরা দুর্গ পাহারা দিচ্ছিল, ভজু তাদের কাছে গিয়ে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে লাগল। সে ছেলেমানুষ, তাতে অতি বোকা, তাকে ভেতরে যেতে দিলে কোনও আশঙ্কা নেই। কাজেই দু-চারজন যেতে দিতে এক রকম রাজীই হল। কিন্তু পাছে ছোট-রাণী জানতে পেরে গোলমাল বাধান, এই ভয়ে তাদের দলপতি শেষ পর্য্যন্ত ভজুকে ছাড়লেন না।

ভজু দু'দিন সেইখানেই ব'সে রইল। তৃতীয় দিন দেখা গেল, সৈন্যদের মধ্যে একটা কি ভয় ঢুকেছে। সবাইকার মুখ শুকনো, সব যেন পালাতে ব্যস্ত। ভজু এগিয়ে গিয়ে জিগ্‌গেস করলে, ব্যাপারখানা কি? সৈন্যদের দলপতি বললেন, "বড়-রাণীমার বসন্ত হয়েছে। ও রোগ যেমন তেমন নয়, একজনের হলে আশের পাশের সকলের হবে।"

ভজু বললে, "তোমরা ত কেউ ওপরে যাও না, কি ক'রে জানলে যে তাঁর বসন্ত হয়েছে?"

দলপতি বললেন, "যে বুড়ীটা তাঁদের খাবার নিয়ে যায়, সে এসে বলেছে। এখন সে ত আর কিছুতেই ভেতরে যেতে রাজী নয়। ওঁদের

খাবার পাঠাবার কি ব্যবস্থা করা যায় তাই ভাবছি। এখন কোনও লোকই আর ও ঘরে যেতে চাইবে না।"

ভজু বললে, "আমায় যেতে দাও ত আমি রাজী আছি। আমার খেতে পেলেই হল, আমি বসন্ত-টসন্তকে গ্রাহ্য করি না।"

আর কোনও লোক যখন পাওয়াই যাবে না, তখন দলপতিকে অগত্যা রাজী হতে হল। ভজু খাবারের বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে, অনেক কষ্টে ভাঙা দেওয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌ল। সেই পাথরের ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিতে লাগল। খানিক পরে দরজা খুলে বড় রাজকুমার উঁকি মেরে দেখলেন।

ভজু মহা খুশি হয়ে ব'লে উঠল, "রাজকুমার, রাজকুমার, আজকে আমি খাবার নিয়ে এসেছি।"

রাজকুমারও খুশিই হয়েছেন মনে হল, তবু তাঁর মুখের ভাবটা কেমন কেমন যেন লাগল। ভজুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে তিনি বললেন, "শীগগির ভেতরে চ'লে এস, আমি বেশীক্ষণ দরজা খুলে রাখতে পারব না।"

ভজু সব কিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দেখলে, একখানা খাটের উপর কে একজন মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, আর-একখানা খাটের উপর ছোট রাজকুমার মুখ শুকিয়ে ব'সে আছেন। ভজু খাবার দাবার গুছিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলে, "ঐ বুঝি রাণীমা? তিনি কি কিছুই খেতে পারেন না?"

বড় রাজকুমার বললেন, "চুপ, চুপ, অত জোরে চেঁচাসনে, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে; মা এখানে নেই।"

ভজু অবাক্ হয়ে চোখ বড় বড় ক'রে বললে, "তিনি কোথায় গেছেন? কি ক'রে গেলেন? চার দিকে ত লোক?"

বড় রাজকুমার বললেন, "তুই আমাদের নিজের লোক, তাই তোর কাছে বলছি, কিন্তু একথা যেন কিছুতেই বাইরে প্রকাশ না পায়। আমাদের মামার বাড়ীর লোকেরা আমাদের নিয়ে পালাবার জন্যে খুব

চেষ্টা করছে। সামনাসামনি যুদ্ধ করলে ত তারা হেরে যাবে, তাই লুকিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে চায়। ঐ যে কোণটায় একটা পাথর আলগা দেখছিস, ওটা সুড়ঙ্গের মুখ। কাল রাত্রে মা ওর ভেতর দিয়ে পালিয়েছেন। তিনি আগে যেতে চাননি, আমরা তাঁকে জোর ক'রে পাঠিয়েছি। ধরা পড়বার ভয়ে আমরা মায়ের বসন্ত হয়েছে ব'লে রটিয়েছি, আর একটা কাপড়ের বস্তা মায়ের খাটে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। একটা বোবা-কালা ঝাড়ুদার সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘর ঝাঁট দিতে আসে, তাকে কিছু ভয় নেই। তবে যে লোকটা খাবার আনত, তাকে ভয় ছিল। তুই তার জায়গায় এসেছিস, এখন কোনও ভয় নেই।"

ভজু বললে, "তোমরা সবাই কাল পালালে না কেন?"

রাজকুমার বললেন, "শুধু এ ঘরটার থেকে বেরলেই ত হবে না, এ রাজ্য থেকে বেরতে হবে। তা করতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে। সবাই একসঙ্গে পালালে, পরদিন যখন খাবার আনবে, তখনই সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাই পাঁচ ছ' দিন ধ'রে ক্রমাগত ওদের ধাপ্পা দিতে হবে। কি ক'রে সেটা হবে, তাই ভাবছি।"

ভজু বললে, "আজ রাত্রে তোমরা দু'জন পালাও ত, তারপর দেখা যাবে। খাবার ত আমিই আনব, আর ঝাড়ুদার ত বোবা কালা, কাজেই চার পাঁচ দিন কেউ জানতে পারবে না। তারপর সময় বুঝে আমিও স'রে পড়ব।"

রাজকুমার বললেন, "কিন্তু আর একটা মুস্কিল আছে। তিনজনের যে গাদি গাদি খাবার আসতে থাকবে, সেগুলো কি হবে? ঝাড়ুদারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—ঘরের মধ্যে যা কিছু পাবে, সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে। বাইরে বোধহয় ওরা সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে নেয়, তার ভেতর দিয়ে আমরা কোনও খবর টবর-পাঠাচ্ছি কিনা। যদি রাশ রাশ খাবার যেমন ঢুকছে তেমনই বেরচ্ছে দেখে, তখনই সন্দেহ করবে।"

ভজু একটুক্ষণ ভাবল, তারপর বললে, "তা হোক, তোমরা যাও।

আমার আর কোনও শক্তি নেই, শুধু খেতে পারি। তা তোমাদের জন্যে না-হয় খেতে খেতে মরেই যাব। ঝাড়ুদার শাল-পাতার ঠোঙা ছাড়া আর কিছু নিয়ে যাবার খুঁজে পাবে না।"

রাত্রি হতেই রাজকুমারেরা সুড়ঙ্গ দিয়ে পালালেন। পরদিন ভজু ঠিক সময়ে খাবার নিয়ে গিয়ে হাজির হল। ঘর খালি। তিন জনের বিছানার উপর সে কাপড় চোপড় বালিশ সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল, যেন তিন জন ঘুমোচ্ছেন। তারপর ব'সে গেল খেতে। এমন চমৎকার সব খাবার, যত খায়, ততই তার ক্ষিদে যেন বেড়ে যায়। প্রায় সবই সে শেষ ক'রে ফেলল। তারপর আর তার উঠবার ক্ষমতা রইল না। মেঝেতে প'ড়ে সে ঘুম দিতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় বোবা ঝাড়ুদার এসে তাকে গুঁতো মেরে উঠিয়ে দিল। বিছানায় কে আছে না আছে, তা আর চেয়েও দেখল না। রাত্রে এমন জায়গায় থাকতে ভজুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সেও ঝাড়ুদারের পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ল।

ঝাড়ুদার তার ঝাঁটা বালতি নিয়ে সোজা দলের দলপতির কাছে হাজির হল। সে ব্যক্তি উলটে-পালটে সব আবর্জ্জনা-গুলো দেখে বললে, "খাবার কিছু কিছু থেকে গিয়েছে দেখছি।"

ভজু তাড়াতাড়ি বললে, "সকলেরই শরীর খারাপ কিনা, বেশী খেতে পারেন না।"

দলপতি বললেন, "আচ্ছা এক কাজ জুটেছে বাবা! কখন যে আমাদেরও বসন্তে ধরে তার ঠিক নেই। খুব বেশী অসুখ নাকি ছেলেদেরও? বদ্যি-টদ্যির ব্যবস্থা করতে হবে?"

ভজু ভয় পেয়ে বললে, "না না, তেমন কিছু নয়। মায়ের অসুখের জন্যে মন খারাপ, তাই তারা খেতে পারে না।"

মনে মনে সে ঠিক করল, কাল মরে গেলেও সে সব খাবার শেষ করবে।

পরদিন খাবার নিয়ে গিয়েই সে খেতে ব'সে গেল। প্রাণ যায় তাও

স্বীকার, তবু সে সব শেষ করবে। সন্ধ্যা হবার আগে, খাবারের স্তূপ শেষ হল বটে, কিন্তু ভজু বেচারার আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না। কিন্তু রাত্রে ত এখানে থাকা যায় না! কোনও রকমে সে বেরিয়ে এল। তার পেটের বহর দেখে দলপতি আর সৈন্যরা ত অবাক্। দলপতি জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে, একি হয়েছে?"

ভজু কোঁকাতে কোঁকাতে বললে, "কি জানি, কি অসুখ। পিলেটা ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে।"

তার পরদিনটাও এই ভাবে কাটল। সেদিন ভজু বেচারা আর নিজে বেরতে পারল না, ঝাড়ুদার কোনও মতে টান্তে টান্তে তাকে বাইরে নিয়ে এল। দলপতি বললেন, "এ ছোঁড়াও মরবে। এমন পিলে জন্মে কারো দেখি নি।"

সকালে উঠে ভজু ভাবছিল, আজ আর যাবে কিনা। পেটের যা অবস্থা হয়েছে, হঠাৎ ফেটেও যেতে পারে। তবু মনিবের জন্যে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।

সে আস্তে আস্তে যাচ্ছে, এমন সময় একটা লোক এসে তাকে ধরল। কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম ভজু?"

ভজু বললে, "হ্যাঁ।"

সেই লোকটি বললে, "আমি বড়-রাণীমার রাজ্য থেকে আসছি। তারা পৌঁছে গেছেন, তোমায় নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন। তোমাকে না হলে রাজকুমারদের কিছুতেই চলবে না।"

ভজু মনের আনন্দে বেরিয়ে পড়ল। নূতন দেশে গিয়ে, তার আদর রেখে কে? সবাই তাকে এত আদর ক'রে খাওয়াতে লাগল যে, ভজুরও খাওয়ায় অরুচি ধরবার জোগাড়। সে বেশী খায় বললে, রাণী আর রাজকুমারেরা সবাই চটে যান, আর বলেন, "বেঁচে থাক আমাদের ভজুর খাওয়া, ঐ গুণে আমরা রক্ষা পেয়েছি।"

নীলাম্বরী

ঢং ঢং ঢং, স্কুলের শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে মেয়ের দল, স্কুল বাড়ীর সব ক'খানা ঘর খালি করে চাতালে বেরিয়ে এল। গাড়ীবারান্দার নীচে ভীড় সবচেয়ে বেশী। সার সার স্কুলের বাস গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষয়িত্রী একজন দাঁড়িয়ে আছেন, মেয়েরা ঠিক গাড়ীতে ওঠে কিনা তার তত্ত্বাবধান করতে।

এটা হল কিছুদিন আগেকার কথা। তখনও সব স্কুলে এখনকার মত মোটর বাস্ হয় নি। বড় বড় ঘোড়াতেই স্কুলের গাড়ী টানত। কাজেই দু-তিন খেপ না গেলে চলত না। যারা দ্বিতীয় বারে কি তৃতীয় বারে যেত, তাদের বাড়ী পৌছতে অনেক দেরী হয়ে যেত। কাজেই অধিকাংশ মেয়েরই চেষ্টা ছিল, কি করে শিক্ষয়িত্রীর চোখ এড়িয়ে প্রথম বারেই গাড়ীতে উঠে পড়া যায়। ধরা পড়লে বেশ বকুনি আছে অদৃষ্টে কিন্তু সেই ন'টায় বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত বসে থাকতে কোনও মেয়েরই মন উঠত না। নিতান্ত যাদের বোর্ডিংএর কোনও মেয়ের সঙ্গে বেশী ভাব আছে, তারা দু-চারজন গল্প করবার লোভে থাকতে রাজী হত, আর কেউ না। বাকীরা লুকিয়ে চুরিয়ে গাড়ীতে উঠে, একেবারে ভিতর দিকের কোণে লুকিয়ে বসত, যাতে শৈলজাদি তাদের দেখে নামিয়ে না দেন। অবশ্য এরকম নামিয়ে দেওয়াটাও প্রায় সকলের ভাগ্যেই ঘটত।

সুধার শরীরটা আজ ভাল ছিল না। ঝি আসেনি বাড়ীতে, কাজেই মা তাড়াহুড়ো ক'রে বেশী কিছু রান্না ক'রে উঠতে পারেন নি। নিতান্ত আগুনের মত গরম ভাতে ডালের জল মেখে লেবু দিয়ে দু-চার গ্রাস খেয়ে সে চলে এসেছে। মা তাকে আসতে বারণই করেছিলেন, কিন্তু সে রাগ ক'রে শোনে নি। নিত্য ঝি আসে নি, নিজের অসুখ, মায়ের

অসুখ, এই-সব অছিলায় কত আর কামাই করা যায়? হেড্‌মিস্ট্রেসের কাছে বকুনি খেতে ত তাকেই হয়? টিফিনের সময় সে কিছু খায় না। তাদের ঐ এক ঠিকে ঝি সম্বল, সে এতদূরে খাবার নিয়ে আসতে নারাজ। অনেক মেয়ে বোর্ডিংএ খরচ দিয়ে টিফিন খায়, সুধার বাবার অবস্থা ভাল নয়, তিনি তাও করতে পারেন না। কাজেই স্কুল যখন ছুটি হয়, তখন সুধার পেটটা একেবারে জ্বলে যেতে থাকে। সে আসে 'সেকেণ্ড বাসে', কাজেই প্রথমবারে যাবার অধিকার তার নেই, তবে প্রায়ই সে লুকিয়ে যায়, কোনওদিন ধরা পড়ে, কোনওদিন বা পড়ে না।

আজ তার যাবার তাড়া ছিল সবচেয়ে বেশী। শরীর ভাল নয়, ক্ষিদেও পেয়েছে ভয়ানক। ঝি নিশ্চয়ই এ বেলাও আসেনি, মা একলা-হাতে সব কাজ কখনও পেরে উঠবেন না। খোকাই তাঁকে জ্বালিয়ে খাবে। কিন্তু আজ যে যেতে পারবে, তা তার মোটেই আশা হচ্ছিল না। কে দু'জন মেয়ে বেড়াতে এসেছিল, স্কুলের পুরোনো ছাত্রী বোধ হয়। শৈলজাদির ঘরে বসে তারা সারাদিন গল্প করেছে, চা খেয়েছে, এখন নেমে এসেছে—বাড়ী ফিরবার জন্যে। ও মা, তিনি দেখি তাদের সুধাদের বাসেই তুলে দিচ্ছেন। তা হ'লেই হয়েছে সুধার আজ আগে আগে বাড়ী যাওয়া। যাদের সত্যিই প্রথমবার যাবার পালা, তাদেরই দু'চারজনকে না নামিয়ে দেওয়া হয় ত ঢের।

নিজের গোছান বইখাতা-গুলো নিয়ে সুধা চাতালের একটা কোণে, বড় একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। হলের ভিতর ঢুকতে আর তার ইচ্ছে করছিল না। মস্ত বড় চাতাল, জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা পড়ে সবুজ, জায়গায় জায়গায় কালের প্রভাবে কালো এবং ভাঙ্গা, মস্ত মস্ত গোল থাম দিয়ে ঘেরা। এই চাতালটাতে টিফিনের ছুটিতে মেয়েদের খেলা, গল্প, দৌড়-ধাপ সব চলতে থাকে। এক কোণে খুপ্‌রীর মত একটা ঘর, তার ভিতর দিয়ে ছাদে যাবার সিঁড়ি। এইখানে 'ডে স্কলার' মেয়েদের জল খাওয়ার স্থান। বন্ধু-বান্ধবরা ডাকলে সুধাও

মাঝে মাঝে এখানে ঢুকে খাবার খেয়েছে। আজ যদি তাকে কেউ ডাকত, মন্দ হত না।

তার চারপাশে মেয়ের দল ঘোরাফেরা ক'রে গল্প করছিল। স্কুলের ছুটির পর দৌড়োদৌড়ি ক'রে খেলার মত উৎসাহ কোনও মেয়েরই আর থাকে না, অর্দ্ধেক তার মত বসে পড়ে, বাকি অর্দ্ধেক গল্প ক'রে ঘুরে বেড়ায়।
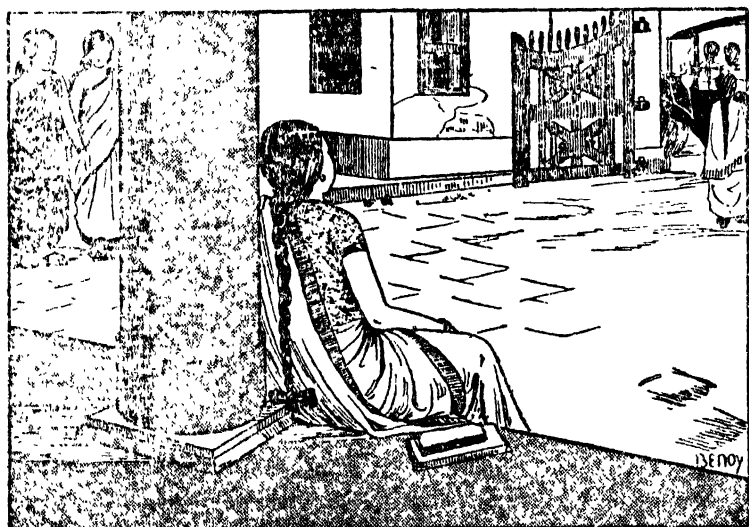
স্বধা চাতালের একটা কোণে, বড় একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

তার সামনে দিয়ে কলেজের নিভাদির সঙ্গে পারুল বারবার ঘুরে যাচ্ছিল। নিভাদির সঙ্গে পারুলের বেজায় ভাব। এই নিয়ে স্কুল শুদ্ধ মেয়ে তাকে ঠাট্টা করে, কিন্তু পারুলের এতে গর্ব্বের সীমা নেই। নিভাদির মত 'স্মার্ট' বিদুষী মেয়ে কলেজে ক'টাই বা আছে? দেখতে অবশ্য তিনি সুন্দরী কিছু নন, কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়ালে সুন্দরী মেয়েদেরও যেন কেমন হাবাগোবা দেখায়। তাঁর লম্বা ছিপছিপে চেহারাটি ঠিক যেন আলোক-শিখার মত, কোথাও তার ভার বা জড়তা

নেই। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বড় জোর বলা যায়, কিন্তু যে রংএরই কাপড় পরুন, তাঁকে দিব্যি মানায়। ঐ ত পারুল তাঁর পাশে পাশে বেড়াচ্ছে, সেও ত ফর্সা বলেই বিখ্যাত, কিন্তু নিভাদির পরণে ঐ যে জরির পাড় দেওয়া নীলাম্বরী শাড়ীখানা, ওখানা পারুল পরলে কি তাকে অত ভাল দেখাত? কখনও না।

আচ্ছা, নিভাদি ত বিশেষ বড় লোকের মেয়ে না, এত সাজেন কি ক'রে? যে-রকম কাপড়-চোপড় তিনি রোজ পরে কলেজে আসেন, সে-রকম কাপড় সুধার একখানাও নেই। উৎসব নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতেও তাকে ধোওয়া মিলের শাড়ী পরে যেতে হয়—এই দুঃখ আর লজ্জায় সে কোথাও যেতেই চায় না। না যাওয়ার কারণটা মা-বাবাকে জানানও শক্ত, তাঁরা অমনি বকতে ব'সে যাবেন— যেন ভাল জিনিষ ভাল লাগাটা মস্ত একটা অপরাধ। সাদাসিধে জীবনযাত্রা এবং মহৎ চিন্তা যে কত বড় জিনিস, সেই বিষয়ে বাবার কাছে লম্বা একটা বক্তৃতা শুন্‌তে হয়। বেশ ত, মহৎ চিন্তা কি একখানা ভাল কাপড় পরে করা যায় না? একথা মা-বাবা কিছুতেই বুঝবেন না। মা-বাবার দুঃখ-দারিদ্র্য বেশ ভাল ক'রে বুঝবার মত বয়স সুধার তখনও হয় নি।

নিভাদির শাড়ীটা আজ সুধার চোখে বড়ই সুন্দর লাগছিল। সুধার গায়ের রং প্রায় ফরসাই—এরকম একখানা শাড়ি হলে তাকে নিশ্চয় মানাত। কিন্তু কে বা তাকে দিতে যাচ্ছে। সামনের মাসে তার জন্মদিন বটে, কিন্তু কি যে সে পাবে তার তা জানাই আছে। যদি মায়ের হাতে পয়সা থাকে, তাহলে কাপড়ওয়ালী বিধুমুখীকে ডেকে আড়াই টাকা তিন টাকার একখানা তাঁতের শাড়ি কিনে দেবেন, না হলে সেই ধোওয়া মিলের শাড়ী।

ভাবতেই সুধার চোখে জল এসে গেল। এত বয়স হল, অথচ একদিনের জন্যে একটা জরিপেড়ে কাপড়ও সে পরতে পেল না, সিল্কের কাপড় ত মাথায় থাক্। অথচ আশেপাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলো জন্মাতে না জন্মাতেই সিল্ক-সাটিনে মোড়া হয়ে থাকে। ঐ ত সেদিন

তড়িৎদির খুকীটা হল। বাবা! মেয়ে হবার আগের থেকেই তার জন্যে দু'বাক্স কাপড়-জামা তৈরি হয়ে রইল।

ঘড়্ ঘড়্ ক'রে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল। সুধা সচকিত হয়ে চেয়ে দেখল। ঐ ত সবে ফৈজুর গাড়ী এল, এর পর আসবে সৈয়দের গাড়ী, তারপর সুধাদের গাড়ী। এই গাড়ীতে নিভাদি যান, পারুল তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হলের ভিতর থেকে তাঁর গোছান বইখাতা সব নিয়ে এল। নিভাদি গাড়ীতে উঠে পড়লেন, অন্য মেয়েরাও ছুটোছুটি ক'রে এসে উঠল, গাড়ী ছেড়ে দিল।

পারুল গাড়ীর কাছ থেকে ফিরে এসে, কি মনে ক'রে সুধার পাশে ব'সে পড়ল। বল্‌লে, "অমন হাঁড়ি-মুখ ক'রে ব'সে আছিস্ কেন রে?"

পারুলকে সুধার বিশেষ কিছু ভাল লাগত না। তবু কথা যখন যেচে বলছে, তখন ত আর উত্তর না দিয়ে থাকা যায় না? বললে, "আমার আজ শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।"

পারুল জিজ্ঞেস করল, "তাহলে ফার্ষ্ট বাসে চলে গেলি না কেন?"

সুধা বল্‌লে, "কোথায় আর জায়গা পেলাম? বাইরের দু'জন মেয়ে উপরি গেল।"

পারুল বললে, "তা বেড়া না? ব'সে থাকিস্ কি ক'রে? আমি ত হাজার ক্লান্ত হলেও বসতে পারি না।"

সুধা বিরক্ত হয়ে বসলে, "তা নিভাদির পাশে বেড়াতে পেলে তোমার আর ক্লান্ত লাগবে কোথা থেকে? আমার ত আর ওরকম বন্ধু কেউ নেই?"

পারুল খোঁচা খেয়ে পরম আপ্যায়িত হয়ে বললে, "সত্যি ভাই, নিভাদির সঙ্গে বেড়াতে পেলে আমার মোটেই ক্লান্ত লাগে না। আচ্ছা, আজ তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল, না? শাড়ীখানা কেমন লাগল তোর?"

সুধা উপেক্ষার ভান ক'রে বললে, "কেমন আবার লাগবে, কাপড় যেমন হয়।"

পারুলের বোধহয় আশা ছিল যে সুধা শাড়ীখানার খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবে। সুধার কথায় একটু দ'মে গিয়ে বললে, "আমার কিন্তু ভাই ওটা ভারি ভাল লেগেছিল। কাপড়ওয়ালার দু-পুঁটলি কাপড় তোলপাড় ক'রে তবে ওখানা আমি বার করেছিলাম।"

সুধা বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, "শাড়ীখানা তুমিই দিয়েছ নাকি নিভাদিকে ?"

পারুল ঘাড় নেড়ে হেসে বললে, "হ্যাঁ, জানুয়ারী মাসে ওঁর জন্ম-দিন না ? তখন দিয়েছি। একবারও পরতে দেখিনে, আমি অনেক ক'রে বলাতে আজ প'রে এসেছিলেন।"

সুধা একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে বসল, "শাড়ীখানার দাম কত রে ?"

পারুল সগর্ব্বে বললে, "বারো টাকা। বাবা, ছ-মাস পকেট-মানি জমিয়ে তবে কিনেছি।"

সুধা আবার জিজ্ঞেস করলে, "ওখানা এগার হাত ত ? দশ হাত একখানার দাম কত হয় তাহলে ?"

পারুল বললে, "টাকা দশ হবে বোধহয়। কেন তুই কিনবি নাকি ?"

সুধা নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমি কিনব না আর কিছু। এমনি কথার কথা একটা জিজ্ঞেস করছিলাম।"

এমন সময় ঢং ঢং ক'রে বোর্ডিং-এর ঘণ্টা বেজে উঠল। পারুল জিভটা সভয়ে খানিকটা বার ক'রে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। সুধার গাড়ীখানাও আজ কি ভাগ্যে কয়েক মিনিট আগে এসে পৌঁছল। সুধা নিজের বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল।

সারা পথ গাড়ীতে যেতে যেতে একই কথা সে ভাবতে লাগল। দশ টাকার শাড়ী মা সাত জন্মেও তাকে কিনে দেবেন না। তাঁর নিজেরও বোধহয় দশ টাকা দামের কোনও কাপড় নেই। বিয়ের সময়ের সেই লালপেড়ে গরদখানা ছিল, তা সেখানাও ক্রমাগত প'রে প'রে ছিঁড়ে এসেছে। এক সুধা যদি নিজে টাকা জমিয়ে কিনতে পারে।

কিন্তু কোথা থেকে সে পয়সা জমাবে? সে ত আর বোর্ডিংএর মেয়েদের মত পকেট-মানি পায় না। ছেলে-মানুষ সে, বিদ্যাবুদ্ধি এত কিছু নেই যে মাষ্টারি ক'রে বা ট্যুইশনি ক'রে টাকা আনবে।

ভাবতে ভাবতেই বাড়ী এসে পৌঁছল। ঝি এবেলাও আসেনি, কাজেই ফিরে এসেই খেতে পাওয়ার বদলে সুধাকে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে নোংরা কলতলায় ব'সে যেতে হল। দুঃখে এবং শারীরিক ক্লান্তিতে সুধার চোখে জল এসে পড়েছিল, শাড়ীর চিন্তা তার মন থেকে উড়েই গেল।

বাসন মাজা শেষ হতে না হতেই মা খাবার তৈরী ক'রে সুধাকে ডাক দিলেন। গরম গরম পরোটা আর ও-বেলার মাছের তরকারি খেতে পেয়ে সুধার মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হল। খাওয়ার বাসনগুলো চট্ ক'রে তুলে ধুয়ে দিয়ে, সে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দু'খানি মোটে তাদের ঘর। একখানিতে সুধারা দুই মায়ে ঝিয়ে শোয়, ছোট খোকাও অবশ্য মায়ের সঙ্গেই থাকে। আর একখানা ঘরে সুধার বাবা আর তার দাদা বিকাশ শোয়। ঐ ঘরেই লোকজন এলে বসে, বিকাশ পড়াশুনোও করে। সুধাদের ঘরে দুখানা তক্তপোষ, আর ছোট একটা টেবিল, তার উপর সুধার বই, খাতা, দোয়াত, কলম, পেন্সিল সব সাজান থাকে। এক কোণে দেওয়ালের গায়ে ঝোলান আলনাতে তাদের কাপড়-চোপড় থাকে। একটা টুল টেবিলের সামনে সুধার ব'সে পড়বার জন্যে। আর কোনও আসবাব নেই ঘরে। বড় দুটো বাক্স তক্তপোষের তলায় ঠেলা আছে, হঠাৎ ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে না।

অন্য ঘরটায় তক্তপোষ নেই। মাটিতে বিছানা ক'রে সুধার বাবা শোন, বিকাশও তাই শোয়। সকালেই সুধা সে-বিছানাগুলো গুটিয়ে এ ঘরে নিয়ে আসে। ওখানেও ছোট একটা টেবিল আছে, তবে এ ঘরের খানার চেয়ে কিছু বড়। গোটা-তিন চেয়ার আর একটা বেঞ্চি আছে সেখানে, বাইরের কেউ এলে বসে।

নিজের টেবিলটার সামনে ব'সে ব'সে সুধা উপায় চিন্তা করতে লাগল। সত্যি, এ রকম ক'রে আর পারা যায় না। তেরো পূরে চোদ্দয় পা দিতে চলেছে সে, অথচ এখন পর্যান্ত দু-আনা পয়সা কখনও নাড়া-চাড়া করেনি। মা-বাবা গরীব, কোথা থেকে তাকে দেবেন? কিন্তু গরীবের মেয়ে ব'লে কি সুধার সখ ব'লেও কোনও জিনিষ নেই, না, স্কুলের মেয়েদের কাছে মান রেখে চলতে তার ইচ্ছা করে না?

পাশের বাড়ীর উষা এসে ডাকল, "এই সুধা, চল না ভূতিদের ছাদে একটু বেড়িয়ে আসি।"

সুধা উঠে পড়ল। ভূতিদের বাড়ী কাছেই, গলিটা পার হলেই হয়। তাদের মস্ত বাড়ী, ছাদটাও মস্ত। সুধা, উষা প্রভৃতি পাড়ার মেয়েরা প্রায়ই বেড়াতে এখানে আসত, কারণ তাদের বেড়াবার আর কোনও জায়গা বড় ছিল না।

ভূতিদের বাড়ী যেমন বড়, তেমনই লোকজনও এক পাল। তার নিজের মা বাবা, ভাই-বোনরা ত আছেই, তা ছাড়া নিকট এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভর্ত্তি। সুধারা দোতলায় উঠেই শুনল ভূতি ছাদে আছে, তারাও সোজাসুজি উপরে চলে গেল।

ভূতি আর তার বোন কুশি ছাদের এক কোণে ধুপধাপ ক'রে খুব স্কিপ করছিল। সুধাকে ডেকে বললে, "এই লতাপাতা, স্কিপ করবি ত আয়।"

সুধা বললে, "বাবা! এই ত স্কুল থেকে এলাম, এখন অত ধিন্-ধিন্ ক'রে লাফাবার ক্ষমতা নেই।"

কুশি বললে, "হ্যাঁ, পড়তে আমার বাবার হাতে ত বুঝতে ঠেলা। স্কুলেই যাও, আর মাটিই কোপাও, সন্ধ্যাবেলা ধিন্-ধিন্ ক'রে নাচতেই হবে। শুনছিস, আবার পরশু থেকে আমাদের ঘুঁসি-লড়া আর লাঠি-খেলা শেখাবার মাষ্টার আসছে। তোরা কেউ শিখবি?"

উষা বললে, "আমরা ত আর পল্টনের সেপাই হব না, ও-সব শিখে কি হবে? বরং গান-বাজনা কি ছবি-আঁকা হলে শিখতাম।"

ভূতির দৌড়ধাপ, মারপিট বেশ ভাল লাগে। বাড়ীর সকলে তাকে 'মদ্দা ভগবতী' ব'লে ক্ষ্যাপায়, কেবল তার বাবা ছাড়া। তাঁর এ-সবে ভারি উৎসাহ। তিনিই জোর ক'রে মেয়েদের লাঠি-খেলা ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থা করছেন।

কুশির ও-সব কিছু ভাল লাগে না, তার ভাল লাগে ছবি আঁকা, কাপড়ে ফুল তোলা— এই সব ; কিন্তু বাবা সে-সব কথায় কানই দেন না। ছেলে নেই ব'লে, মেয়েদেরই ছেলের মত ক'রে মানুষ করতে তিনি ব্যস্ত।

তাই উষার কথায় কুশি বললে, "হ্যাঁ, শেখাচ্ছে গান-বাজনা! বলে একটা শেলাইয়ের টীচারের জন্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখে রক্ত উঠে গেল, কিন্তু কিছুতেই যদি বাবা কথাটা কানে তুললেন। বেশী চেঁচালেই বলেন, 'নিজেরা নে না জোগাড় করে'।"

হঠাৎ সুধার মাথায় একটা বুদ্ধি খে'লে গেল। আচ্ছা, সে ত বেশ ভাল শেলাই জানে। প্রত্যেকবার ক্লাশের শেলাইয়ের প্রাইজটা ত সে পায়ই, তা ছাড়া একবার মেলাতে মেডেল শুদ্ধ পেয়েছে। সে কি কুশিকে শেলাই শেখাতে পারে না? বলে দেখবে নাকি? তারা যদি সুধাকে পাঁচ টাকা ক'রেও মাইনে দেয়, তা হলেও সুধার কত কাজে লাগে।

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে সে কুশিকে ছাদের একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ভাই, আমি তোকে শেলাই বেশ শেখাতে পারি। আমি উলবোনা, এম্‌ব্রয়ডারি, কাটছাঁট্ সব শিখেছি। আমাকে টীচার রাখবি?"

কুশি খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে থেকে বললে, "তুই হলে ত ভালই হয়, কিন্তু তুই কখন শেখাবি? স্কুল থেকে ফিরতেই ত তোর সন্ধ্যে হয়ে যায়।"

সুধা বললে, "শনি-রবিবারে আসব, দু'ঘণ্টা ক'রে চার ঘণ্টা শেখাব হপ্তায়। তাহলেই ত হবে?"

কুশি বললে, "আচ্ছা, চল মাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।"

কুশির মা তখন ঠাকুরকে কি কি রান্না হবে তাই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কুশি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "মা, সুধাকে আমি শেলাইয়ের টীচার রাখব। ও খুব ভাল শেলাই জানে, সেবারে মেলায় মেডেল পেয়েছে।"

কুশির মা হেসে সুধার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, তুমি পারবে? তোমার সময় কখন হবে?"

সুধা মুখ নীচু ক'রে বললে, "আমি শনিবারে আর রবিবারে দুপুর বেলা আসব।"

কুশির মা বললেন, "আচ্ছা, সে বেশ হবে।"

কুশি সুধাকে টেনে নিয়ে আবার ছাদে চ'লে গেল। আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে সুধা বাড়ী চ'লে গেল। মাইনের কথা যদিও কিছু হল না, তবু সুধা মনে মনে জানল, ওঁরা শুধু শুধু তাকে খাটাবেন না, মাইনে নিশ্চয়ই কিছু দেবেন।

প্রথম শনিবারে সে যখন কুশিদের বাড়ী গেল, তখন ভূতি ছুটে এসে তার হাত ধ'রে বললে, "আসুন আসুন টীচার মশায়, আপনার ছাত্রী ঐ ঘরে ব'সে আছে।"

সুধার একটু লজ্জা হল, সবাই হয়ত তাকে খুব বেশী অদ্ভুত ভাবছে। কিন্তু যখন এসেছেই, তখন পিছোলে চলবে না। ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি শেলাইয়ের সরঞ্জাম টেনে নিয়ে ব'সে গেল। কুশিরও এ দিকে মন খুব, তাকে শেখাতে সুধার কিছুই কষ্ট হল না। সময়টা দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, তারা টেরই পেল না। ফিরে আসবার সময় কুশির মা তাকে জলখাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না, বেশ ক'রে খেয়ে-দেয়েই সে বাড়ীতে ফিরল।

আসবার সময় সিঁড়িতে ভূতির মা বলে দিলেন, "দেখ সুধা, তোমার মাকে বলো যে আমরা তোমায় মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে হাত-খরচের জন্যে দেব।"

সুধা অত্যন্ত খুশি হয়ে বাড়ী ফিরে এল। দশ টাকা ক'রে পেলে তার যে কত কাজ হয়, তার ঠিকানা নেই।

মাসটা কেটে গেল। প্রথম উপার্জ্জনের টাকা হাতে পেয়ে তার যে কি রকম আনন্দ হ'ল তা আর বলবার নয়। টাকাটা নিয়ে এসে সে মায়ের হাতেই দিল। তিনি সেটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি রাখ মা, তোমার পছন্দমত কোনও জিনিষ কিনো।"

সুধা টাকাটা নিজের কাপড়ের বাক্সে রেখে দিল। পরের মাসেই তার জন্মদিন। নীলাম্বরী কাপড় সে স্বচ্ছন্দে কিনতে পারবে। দশ টাকা ত তার রইলই, তা দিয়ে শাড়ী হবে, মা কি আর একটা ভাল জামা তাকে দেবেন না? পারুলকে ঐ রকম শাড়ী একখানা জুটিয়ে দেবার জন্যে ব'লে রাখবে কি না, তাই সুধা ভাবতে লাগল।

জন্মদিন হতে আর সপ্তাহ-খানেক বাকি। সকাল বেলা সুধা শোবার ঘরের সামনের সরু বারান্দাতে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তার লোক-চলাচল দেখছিল। এই জায়গাটিই তার বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় ছিল।

রাস্তা দিয়ে মস্ত বড় একটা গানের দল চলেছে, কি যে গানের কথাগুলো, সুধা প্রথমে বুঝতে পারল না। কিন্তু অতগুলি মানুষের বেদনামাখা গলার স্বর তার মনটাকে কেমন যেন চঞ্চল ক'রে তুলতে লাগল। কি চায় ওরা? কেন অমন ক'রে গান গাইছে?

গানের দল ক্রমে তাদের গলির মধ্যে এসে পড়ল। প্রত্যেক বাড়ীর বারান্দা, জানলার ধার, মানুষে ভ'রে উঠল, ছোট ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে গলিতে নেমে গেল। সুধা যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। বাংলা-দেশের অনেকগুলি জেলা বানের জলে ভেসে গেছে, সেখানকার মানুষ না খেয়ে মরছে, কাপড়ের অভাবে গলাজলে দাঁড়িয়ে থাকছে, দুঃখে-কষ্টে মা ছেলে ফেলে পালাচ্ছে, বাপ আত্মহত্যা ক'রে মরছে। এদের জন্যে এই গানের দল দেশবাসীর করুণা ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে।

যে যা পারে দিতে লাগল। টাকা, পয়সা, পুরনো কাপড়। সুধাও নিজের বাক্সটা একবার খুলল, তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

ফিরে যখন উপরে এল, মা জিজ্ঞেস করলেন, "কি দিলি রে?"

সুধা একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "সেই দশ টাকার নোটটা।"

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সে কি রে? সব দিয়ে দিলি? কিছু রাখলি না!"

সুধা বললে, "না মা, দশ টাকায় অন্ততঃ দশজন মানুষ ত কাপড় পরতে পারবে? আমি না হয় জন্মদিনে পুরনো কাপড়ই পরব।"

চীনে বুদ্ধি

(স্প্যানিশ গল্প অবলম্বনে)

চাওসির ভারি দুর্দ্দিন এসে পড়েছিল কিন্তু তাঁর ধানের ক্ষেতে ফসল হয়েছিল প্রচুর, চায়ের বাগানে চায়ের সাদা ফুলে ডালপালা সব ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল, রেশমের গুটি যা হয়েছিল, তার চেয়ে ভাল ও-দেশে কারও ছিল না। সম্রাটের হাতে লেখা একখানা চিঠি পর্য্যন্ত তিনি পেয়েছিলেন, তাতে চাওসি যে বহুকাল বেঁচে থাকবেন, তার ইঙ্গিত ছিল। সব চেয়ে সুখের কথা এই যে, তাঁর পরম শত্রু পিকং, যে চাওসির বিনুনী কেটে ফেলে মারাত্মক অপমান করেছিল, তাকে অল্প আগেই ঘাতকে কেটে কুচিয়ে ফেলেছে, এ তিনি নিজের চোখে দে'খে এসেছেন।

তবু তাঁর দুর্দ্দিন কেন, তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার, তা বলা শক্ত। কিন্তু দুর্দ্দিন যে এসেছিল তা ঠিকই, নইলে তিনি অপদেবতা ফোর চীনেমাটী দিয়ে গড়া মূর্ত্তিটাকে ক'সে ঠ্যাঙাতে হুকুম করবেন

কেন? সেটা ত ভেঙে মাটীতে গড়াচ্ছিল। চাওসি নিজের বুড়ো রঁাধুনীকে আচ্ছা ক'রে বকুনি দিলেন, যদিও তাঁর অতিথিরা বুড়োর রান্না খেয়ে ধন্য ধন্য করছিল। এক পেয়ালা বহুমূল্য সুগন্ধি চা রাগ ক'রে ফিরিয়ে দিলেন, এমন কি তাঁর পোষা বাঁদরটা এসে যখন তাঁকে আদর করতে লাগল, তখন তাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলেন।

তাঁর তিনটি অতিথি বসবার ঘরের মাঝখানে আসন-পিঁড়ি ক'রে বসেছিলেন। খাওয়া হয়ে যাবার পরে তাঁদের সম্বোধন ক'রে চাওসি বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, আমি আমার ছেলেকে মহামহিম সম্রাটের দরবারে হাজির করতে ইচ্ছা করি।"

সম্রাটের নাম হবামাত্র বক্তা এবং শ্রোতা সকলেই মাথা নুইয়ে প্রায় মেঝেতে ঠেকিয়ে ফেললেন, এবং বাঁদরটাও তাঁদের দেখাদেখি ঠিক সেই রকম করছিল ব'লে, তাকে বসবার ঘর থেকে দূর ক'রে দেওয়া হল।

চাওসি আবার বলতে লাগলেন, "আমার ছেলে টিকু মোটেই মানুষ হচ্ছে না, যদিও তাকে আমি খুব ভাল শিক্ষা দিচ্ছি। কি রকম ক'রে আঠারবার ঝুঁকে প'ড়ে নমস্কার করতে হয়, তা সে জানে না, আমাদের সভ্য-সমাজের সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় রীতিনীতিও কিছু বোঝে না। লিসিংএর গুণবতী মেয়ে, যার পা ছু'খানি বাদামের খোলায় ধ'রে যায়, তাকে কি না সে বিয়ে করতে নারাজ। আর তোমরা শুনে অবাক হবে যে চঙ যখন তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান ক'রে বললে যে, সে নিজের পেট কেটে ফেলতে পারে না, তখন টিকু মোটেই এগোল না। চঙ, দিব্যি তার সামনে হাসতে হাসতে নিজের পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়ে মারা গেল। এর চেয়ে কলঙ্কের কথা আর কি আছে? এখন পরিবারের মান রাখবার জন্যে আমার কি করা উচিত, তোমরা ভেবে-চিন্তে বল। তোমরা যা স্থির করবে, আমি সেই অনুসারে কাজ করব।"

অতিথিদের মধ্যে যাঁর বয়স সব চেয়ে বেশী, তিনি বললেন, "প্রথমতঃ টিকুকে তোমার ত্যজ্যপুত্র করা উচিত।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, "আমরা পাঁচজন যে তোমার আত্মীয়-স্বজন আছি, তাদের মধ্যে তোমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দেওয়া উচিত।"

তৃতীয় জন বললেন, "আমরা সব একগোষ্ঠীর লোক, তোমার ছেলের কলঙ্কে আমাদের সকলের কলঙ্ক হয়েছে। এর প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তোমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত, না হলে গোষ্ঠীর মান থাকে না।"

এই ব'লে আত্মীয়-বন্ধুরা বিদায় হলেন। তাঁদের ডেকে এনে পরামর্শ চাওয়ার জন্যে চাওসি এখন মনে মনে অনুতাপ করতে লাগলেন।

বিকেল বেলা তিনি তাঁর ছোট স্ত্রী টীয়ানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন; তাঁর হাতে একটি হাতীর দাঁতের বাক্স, তাতে নানা রকম সুন্দর ছবি আঁকা।

তাঁর স্ত্রী খুসি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জন্যে কি নিয়ে এসেছ?"

চাওসি বললেন, "এমন জিনিষ যে দেখলে একেবারে অবাক হয়ে যাবে।"

টীয়ান শুনে ব্যগ্রভাবে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসলেন। চাওসি বাক্সটা বিছানার উপর নামিয়ে রেখে বললেন, "তুমি আদর্শ স্ত্রী ছিলে এবং ইতিহাসে যাতে পরম গুণবতী বলে তোমার নাম থাকে, আমি তার ব্যবস্থা করতে চাই। আমার পরিবারের মান বজায় রাখার জন্যে একটি বলি দরকার। আমাকে ত মহামহিম সম্রাট অনেক কাল বাঁচবার অঙ্গীকার পত্র লিখে দিয়েছেন, কাজেই আমি জোর ক'রে ম'রে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখাতে পারি না। সুতরাং আমি ঠিক করেছি, তোমার উপরেই এই গৌরবজনক কাজের ভার দেব। এই বাক্সের মধ্যে এক গাছা রেশমের দড়ি পাবে। ওটা গলায় দিয়ে ম'রে তুমি আমাদের মান রক্ষা কর।"

টীয়ান অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন, "প্রভু, আমি অত্যন্ত ভীতু, নিজে নিজেকে মারতে কিছুতেই পারব না।"

চাওসি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভয় পেয়ো না। যদি নিজে না পার, তা হলে বুড়ো রাঁধুনিটাকে ডেকো, সে তোমায় সাহায্য করবে।" এই ব'লে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টীয়ান বুড়ো কিনকে ডেকে পাঠালেন। সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এসে হাজির হল।

চাওসি বললেন, "এমন জিনিষ যে দেখলে একেবারে অবাক হয়ে যাবে।"

টীয়ান বললেন, "তোমার একটু বিশ্রাম দরকার।"

কিন চোখ রগ্‌ড়াতে রগড়াতে বললে, "আমার রাত্রে মোটে ঘুম হয় না।"

টীয়ান বললেন, "তুমি খুব গুণের চাকর। পরলোকে তোমার

জন্যে যে পুরস্কার অপেক্ষা ক'রে আছে, তা পাবার জন্যে নিশ্চয়ই তুমি ব্যস্ত আছ ?"

কিন বললে, "বুদ্ধদেব আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন, তা ত জানি না ঠাকরুন।"

টীয়ান বললেন, "তা দেখ, তোমায় একটা কাজের জন্যে ডেকেছি। আমার স্বামীর আদেশে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। পরলোকে একেবারে একলা কি ক'রে যাব ভেবে ভয় পাচ্ছি। তুমিও যদি আমার সঙ্গে এস, তা হলে ভাল হয় ; একজন চেনাশোনা বিশ্বাসী লোক কাছে থাকে। এখানে ত কর্ত্তা তোমার উপর সন্তুষ্ট নন, সেদিন তোমার রান্না ঠেলে সরিয়ে দিলেন। এখানে থেকে কি ক'রবে ?"

কিন বেচারার ছোট ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। টীয়ান বললেন, "ভেবে দেখ। ওখানে ভালই থাকবে। রাজি হও যদি, তা হলে এই দড়িটা নিয়ে ঝুলে পড়। আমি নিজের গহনাগাটি নিয়ে আসছি, তারপর গলায় দড়ি দেব।"

কিন কিছু বলে না দেখে, টীয়ান বাক্স থেকে রেশমের দড়িটা বার ক'রে, তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। বললেন, "আচ্ছা, ঐ জানলার বাইরে গিয়ে গরাদেতে বেঁধে ঝুলে পড়। আমিও এলাম ব'লে।"

কিন ঘর থেকে বার হয়ে যেতে যেতে, বাইরের বারান্দায় একটা শব্দ শুনতে পেল। "বাঁদরটা জিনিষপত্র উল্টোচ্ছে"—ব'লে কিন এগিয়ে চলল, আর মনে মনে ভাবতে লাগল, "আমার দুই কারণে আত্মহত্যা করা উচিত নয়। এক ত ম'রে আর জন্মাব কিনা তার কোনও ঠিকানা নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমি প্রভুর আদেশে সেদিন অপদেবতা ফোর মূর্ত্তি ঠেঙিয়ে ভেঙেছি। পরলোকে আমায় হাতে পেলে হয়ত সে শোধ তুলবে। কাজ নেই বাবা, সেখানে গিয়ে, বেশ আছি"—এই ব'লে সে গলা থেকে ফাঁশটা খুলে ফেলল।

বারান্দায় আবার শব্দ হল। কিন যদিও পোষা বাঁদরটার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিল, কিন্তু সে বেচারার কোনও দোষ ছিল না। চাওসির

গুণবান ছেলে টিকু বাপের লোহার সিন্ধুক খুলে ধনরত্ন সব চুরি করছিল, তারই এই শব্দ। পাশের জানলাটা খোলা ; এটা বেয়ে নামলে, একেবারে বাগানের মধ্যে নেমে পড়া যায়। একটা বেশ বড় থলি মণি-মুক্তায় বোঝাই হয়ে উঠেছিল। থলির ভিতর থেকেও সেগুলি ঝক ঝক ক'রে জ্বলছিল।

কিন অনেক কালের পুরনো চাকর। সে এই ব্যাপার দে'খে অত্যন্ত চ'টে গেল এবং টিকুকে বকতে আরম্ভ করলে, "একে ত ভীরুতার জন্যে বাপের বংশে কালি দিয়েছ, তার উপর আবার চুরি।"

টিকু বললে, "আরে চুপ কর, এখনই কেউ শুনতে পাবে।" কিন্তু কিনের একবার মুখ ছুটেছে, আর কি সে থামে ? সে আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগল।

তখন টিকু বেজায় ভড়্কে গেল। বললে, "আচ্ছা, রেশমের ফাঁসটা আমায় দাও। পরিবারের নামে কলঙ্ক যখন আমিই দিয়েছি তখন মরা উচিত আমারই।"

কিনের আপত্তি ছিল না, সে তাড়াতাড়ি রেশমের দড়িটা টিকুর গলায় পরিয়ে দিল। দড়ির একটা দিক জানলার গরাদের সঙ্গে বেঁধে টিকু ঝুলে পড়তে চলল। কিন্তু প্রথমে ধনরত্নের বোঝাটা কাঁধে ফে'লে নিল। কিন অবাক হয়ে গিয়েছে দে'খে বললে, "অনেক দূরের পথ, খরচার জন্যে কিছু সঙ্গে নিতে হবে ত ?"

কথাটা কিনের ঠিক বিশ্বাস হল না। যা হোক সে কিছু বলল না। টিকু জানলার উপর উঠে ব'সে বললে, "তুমি এখান থেকে চ'লে যাও, আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখলে, তোমার ভয়ানক কষ্ট হবে।"

কিন সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলল। বাগানে ঢুকতে যাবে, এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার একটা বিকট শব্দ আর একটা যন্ত্রণাসূচক চীৎকার শুনতে পেল। তার একটু সন্দেহ হল। গলায় দড়ি দেবার ভান ক'রে, ছোকরা শেষে ধনরত্ন নিয়ে চম্পট দিল নাকি ? কিন তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে ঢুকল।

জানলার থেকে একটা দেহ ঝুলছে, সে দেখতে পেল। নীচে মাটিতেও কি একটা যেন নড়ছে, কিন্ ঠিক বুঝতে পারল না। যাই হোক, নিজের ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে সে ভাবলে, "যাক, হতভাগা মরেছে! টিয়ান-ঠাকরুনকে ত আর একলা পড়তে হবে না, সতীনপো গিয়ে জুটল ব'লে।"

সে নিজের ঘরে গিয়ে দিব্যি ক'রে আফিং টেনে ক'ষে ঘুম দিল।

পরদিন সকালে, চাওসির বাড়ী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে ভ'রে গেল। সকলের পরণে শাদা পোষাক, এইটাই চীনদেশে শোকের চিহ্ন। সকলে চাওসির মৃতদেহের কাছে শেষ উপহার দিতে এসেছেন। কিন্তু চাওসি নিজেই যখন শাদা পোষাক পরে, গম্ভীর মুখে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁরা একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। একজন অত্যন্ত চটে বললেন, "তুমি বেঁচেই আছ? হায়, হায়, আমাদের আর মান থাকল না।"

চাওসি তখন সব কথা খুলে বললেন। সম্রাট তাঁকে বাঁচবার অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিয়েছেন, তিনি কি করে মরতে পারেন? স্ত্রীকে বলেছিলেন, সে ভয়ে মরতে পারল না। বুড়ো কিনের দ্বারাও কাজ হল না, শেষে তাঁর অপরাধী ছেলে স্বেচ্ছায় গলায় দড়ি দিয়ে, সব গোলমাল চুকিয়ে দিয়েছে। আত্মীয়-বন্ধুরা অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করলেন, পরে ঠিক হল যে, টিকু মর্‌লেই চলবে।

তখন চাওসি আত্মীয়দের বললেন, "এস, বাগানে যাওয়া যাক্। সেখানে এখন পর্য্যন্ত কেউ যায় নি। আমরা হতভাগ্য টিকুর মৃতদেহ নামিয়ে আন্‌ব।"

সকলে সার বেঁধে তাঁর পিছন পিছন চললেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবামাত্র সবাই একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। রেশমের দড়ি গলায় দিয়ে একটা দেহ ঝুলছে বটে, কিন্তু দেহটা একটা বাঁদরের।

চাওসি বিস্মিত হয়ে বললেন, "এ আমার ছেলে নয়।"

কিনকে ডাকা হল। সে এসে বললে, "প্রভু, আমি নিজের চোখে

দেখলাম, তিনি দড়ি গলায় দিলেন। নিশ্চয় এই বাঁদরটা আপনার ছেলের রূপ ধরেছে, আর নিজের দেহটা এখানে রেখে গেছে। এখানে কোনও একটা মায়ামন্ত্রের কাণ্ড চলেছে। ফো এমনি ক'রে প্রতিশোধ নিচ্ছে বোধ হয়, তাঁর মূর্ত্তি আপনি ঠেঙিয়ে ভেঙেছেন কিনা।"

টিকু মারা গেলে চাওসির উত্তরাধিকারী হন আত্মীয়েরা, কারণ চাওসির আর ছেলে-পিলে নেই। তাঁরা একবাক্যে ব'লে উঠলেন, "মোটেই তা নয়। এই ত টিকু। দেখছ না বাপের চেহারার সঙ্গে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য?"

চাওসি অত্যন্ত চ'টে বললেন, "আমার চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য? ওর মুখখানা দেখ দেখি ভাল ক'রে?"

আত্মীয়েরা আবার একবাক্যে বলে উঠলেন, "অবিকল তোমার মত মুখ, চাওসি।"

চাওসি বললেন, "ওর কান-দুটো দেখ।"

আত্মীয়েরা বললেন, "ঠিক তোমার মত।"

চাওসি আবার গোলমাল করবার উপক্রম করতেই, একজন তাঁর কানে কানে বললেন, "একজনের মরা ত দরকার? কেন মিছে গোলমাল করছ? চুকে যেতে দাও না?"

চাওসি অবশেষে বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেন যে দেহটা তাঁর ছেলেরই, যদিও দেখতে অনেকটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

টিকু মারা গিয়েছে ব'লে সরকারি আফিস থেকে লিখে দেওয়া হল। বাঁদরের দেহটা নিয়ে বিপুল সমারোহ ক'রে কবর দেওয়া হল। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই স্বীকার করলেন যে পরিবারের মান-রক্ষা হয়েছে, আর কোনও কলঙ্ক নেই।

চাওসিকে যদিও মহামহিম সম্রাট দীর্ঘ জীবন উপভোগ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবুও তিনি আর খুব বেশী দিন বাঁচলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর একটি যুবক এসে তাঁর সম্পত্তি দাবী করল। সে বললে, তার নাম টিকু, এবং সে কয়েক বছর আগে জানলা বেয়ে বাপের বাড়ীর

থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

আত্মীয়েরা কেউ তাকে টিকু ব'লে মানতে চায় না, শেষে আদালতে মোকদ্দমা সুরু হল। দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে একজন বিচারপতি এই রায় দিলেন ঃ—

"টিকুর মৃত্যু হয়েছে ব'লে সরকারি আদালত থেকে লিখে দেওয়া হয়েছে। এই যুবক যে-দিন চাওসির বাড়ী থেকে পালিয়েছিল ব'লে বলছে, সেই দিন কেবলমাত্র একটা বাঁদর ঐ বাড়ী থেকে পালিয়েছিল ব'লে জানা যায়। সে বাঁদরটা কোথায় গিয়েছে, কেউ তা জানে না। যদি এই যুবক উক্ত রাত্রে চাওসির বাড়ী থেকে সত্যি পালিয়ে থাকে, তা হলে এ সেই বাঁদর, আর কেউ নয়। আর এ যদি মিথ্যা কথা ব'লে থাকে, তা হলে সেই অপরাধে একে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।"

টিকু বেচারা দেখলে, উভয় সঙ্কট। ফাঁসী যাওয়ার চেয়ে সে নিজেকে বাঁদর ব'লেই মেনে নিল। একটা বাঁদর-নাচওয়ালার কাছে কয়েক টাকা নিয়ে তার আত্মীয়েরা টিকুকে বিক্রী ক'রে দিলেন। তারপর তাঁরা মনের আনন্দে চাওসির সব সম্পত্তি উপভোগ করতে লাগলেন।

মাটির মায়া

তরঙ্গিণী ব'লে মস্ত বড় এক নদী, তার ধারে ছোট একখানি গ্রাম। নিতান্তই ছোট, বড় জোর একশ' ঘর লোকের বাস। তার ভিতর অধিকাংশই গরীব—চাষী, ক্ষেতের ফসল, বাগানের তরিতরকারির উপরেই তাদের নির্ভর। এদের ভিতর এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের চুলে পাক ধরেছে, অথচ তারা সহর কি-রকম তা চোখে দেখেনি,

রেলগাড়ী কি জিনিষ, তা জানেও না, বর্ণনা ক'রে বুঝিয়ে বলতে গেলে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে।

এই গ্রামে একটি মেয়ে থাকে, তার নাম অমলা। মা, বাবা বা ভাই-বোন বলতে তার কেউ নেই। অনেক বছর আগে এক ভীষণ মহামারীতে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক মারা যায়, সেই সময় অমলারও আত্মীয়-স্বজন যে কেউ ছিল, সকলেই চ'লে যায়। সে শুধু বেঁচে আছে, তাদের ছোট বাড়ীটিতে। গ্রামেরই এক বুড়ী রাত্রে এসে তাকে আগলায়, সারাটা দিন অমলার একলাই কেটে যায়।

কিন্তু সময় কাটাবার জন্যে তাকে ভাবতে হয় না। সুন্দর একটি বাগানের মধ্যে তার কুঁড়েখানি, মাটির দেওয়াল, সোনালী রঙের খড় দিয়ে ছাওয়া। বাগানের চারদিক ঘিরে বাঁশের বাখারির বেড়া, কিন্তু বাখারি একখানিও দেখবার জো নেই, ঝুমকো লতায় তার সবটাই ঢাকা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, চারধার জুড়ে ফুলের পরদা দোলান রয়েছে। ঘরের সামনে ফুলের বাগান, পিছনে তরি-তরকারির বাগান। এই সবের তদারক করতে অমলার সারাটা দিন কেটে যায়, মন ভার ক'রে ব'সে থাকবার কোনই অবসর সে পায় না। এতেই তার খাওয়া-পরাও চলে, পাড়া-গাঁয়ে খরচই বা কি? ভিনগাঁয়ের ব্যাপারীরা এসে ফুল-ফল-তরকারি সব নগদ দাম দিয়ে কিনে নেয়, দূরের শহরে গিয়ে চড়া দামে সব বিক্রী করে।

অমলার দরকার মত গ্রামের হাট থেকে সে চাল-ডাল-মশলা কেনে, তাঁতির কাছে মোটা সূতোর হাতে-বোনা রঙীন শাড়ী কেনে, আবার দু'চার পয়সা গরীব-দুঃখীকে দানও করে। বিলাসিতা কা'কে বলে সে জানেই না, কাজেই তার অভাবে দুঃখও করে না। হাতে, গলায়, চুলে ফুলের মালা দুলিয়ে সে যখন বাগানে ঘুরঘুর ক'রে বেড়ায়, তখন বনদেবীরাও তার রূপ দে'খে হিংসা করেন, মণিমুক্তার গহনা পরা রাজকন্যারাও তার সৌন্দর্য্যের কাছে হার মানেন।

দিন কেটে যায়। গ্রামের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য কিছু নেই, তবু

এটা গ্রামের লোকের কাছে একঘেয়ে লাগে না, তারা চিরকাল এতেই যে অভ্যস্ত। নূতন ধরণের কিছু তারা চায় না, তাদের এই শান্তিময় জীবনই তাদের সব চেয়ে ভাল লাগে।

হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলা গ্রামে সাড়া প'ড়ে গেল। ছিদাম তাঁতির চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে পার্ব্বতীকে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যার সময় একলা সে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ তাকে চোখে দেখেনি। গ্রামে হুলুস্থূল পড়ে গেল। কি হল মেয়ে, কোথায় গেল? এ গাঁয়ে কেউ কারো দুশমন নেই, সবাইকার সঙ্গে সবাইকার ভাইয়ের মত সম্বন্ধ, এখানে একজন আর-একজনের অনিষ্ট করবে কেন? আর কিসের জন্যেই বা করবে? ছিদাম গরীব মানুষ, তার মেয়ের গায়ে কিছু সোনাদানা নেই। কিসের লোভে মানুষ তার ক্ষতি করবে?

গ্রামের লোক যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজি করলে, গ্রামের চৌকিদারকেও খবর দেওয়া হল, কিন্তু ফল কিছু হল না। মেয়েটি মামার বাড়ী যেতে খুব ভালবাসত, সেখানেও লোক গেল খোঁজ করতে, সেখানে সে যায় নি। দিনের পর দিন কেটে চলল, তারপর কখন একদিন লোকে ছিদামের মেয়ে পার্ব্বতীর কথা ভুলে গেল। সংসারের নিয়মই এই যে এখানে কোনও কথাই মানুষে বেশী দিন মনে রাখে না।

কয়েকটা মাস কেটে গেছে, শীতকাল চ'লে গিয়ে বসন্তকাল এসে পড়েছে। ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপূর, নূতন পাতার সবুজ রঙে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। পাখীরা ঝাঁক বেঁধে যেন দেশ বেড়িয়ে বাড়ী ফিরেছে, তাদের মিষ্টি সুরে সমস্ত দিক যেন উৎসবময় হয়ে উঠেছে।

দোল-পূর্ণিমায় গ্রামে ভারি আনন্দ, এইটাই তাদের সব চেয়ে বড় পর্ব্ব। সেদিন ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ কেউ ঘরে থাকে না। আবীরের রঙে গ্রামের পথের ধুলো রাঙা হয়ে ওঠে, রঙে রঙে সব-ক'টি মানুষের কাপড়-চোপড়ের যা শ্রী হয়, রামধনুও তার কাছে হার মেনে যায়। ফুলের শোভা সেদিন শতগুণ বেড়ে ওঠে, পাখীর কণ্ঠে সেদিন সুরের

ঝরণা নেমে আসে। খাওয়া-দাওয়ার কথা কেউ মনেও করে না, বাড়ীর দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সূর্য্য ডুবতে না ডুবতে সোনার থালার মত মস্ত বড় চাঁদ আকাশে আবার আলোর বান ডাকিয়ে উঠে আসে, ঘরে যাবার কিই বা দরকার? রাতটাও প্রায় নৃত্যগীতের উৎসবেই কেটে যায়।

পূর্ণিমার রাত্রি-শেষে উৎসব-ক্লান্ত শরীর নিয়ে অমলা তার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। একটু ঘুম তার নিতান্ত দরকার। পূবের দিকে চেয়ে দেখলে, আকাশ ঝিনুকের বুকের মত স্বচ্ছ আলোয় ভ'রে উঠছে, সকাল হতে খুব বেশী আর দেরি নেই। এখন কি আর ঘুমনো চলবে? কাল সারাদিন বাগানে হাত পড়েনি, আজও কি গাছপালাগুলিকে অবহেলা করা চলে? অযত্নে ম'রে যাবে যে! না, আর এখন ঘুমোবার সময় নেই।

অমলা জোর ক'রে সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফে'লে কাজে লেগে গেল। ঘরে ঢুকেই উৎসবের রঙে চোবান কাপড় ছেড়ে ফে'লে, শাদা একখানি শাড়ী পরে জলের কলসীটি তুলে নিল। তরঙ্গিণী নদীর জলেই গ্রামের সকলের সব কাজ চলে, এমন কি অত বড় বাগানে জল দেবার জলও অমলা কলসা ক'রে নদী থেকে বয়ে নিয়ে আসে। নদীটা খুবই কাছে, তাই তার বিশেষ কষ্ট হয় না। অমলা কলসী নিয়ে আস্তে আস্তে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল।

ওমা, ঘাটের সিঁড়ির ধারে ও কে ব'সে? বসবার ভঙ্গীটা ঠিক যেন ছিদামের মেয়ে পার্ব্বতীর মত। সেই নাকি? ভোরের আধ-আলো, আধ-অন্ধকারে ভাল ক'রে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, পিঠ ভরা চুলের আড়ালে শরীরও যেন ঢাকা প'ড়ে গেছে। অমলা তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে চলল, পার্ব্বতী হলে কি মজাই হয়। প্রায় বছর ঘুরে আসতে চলল, এতদিন মেয়ে কোথায় ছিল কে জানে?

সত্যিই ত পার্ব্বতী! অমলা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ রে পার্ব্বতী, কোথায় ছিলি এতদিন? সবাইকে কি ভোগাই না ভোগালি!"

মেয়েটি আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে অমলার দিকে চাইল। পার্ব্বতীই ত বটে, কিন্তু অমলাকে যে কিছুমাত্র চিনেছে ব'লে ত বোধ হচ্ছে না? অমলা আবার বললে, "কি রে, আমায় চিনতে পারছিস না? আমি যে অমলা। আট-ন'মাসের মধ্যেই ভুলে গেলি?"

মেয়েটি দুই চোখে বিস্ময় ভ'রে অমলার দিকে চেয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে?"

অমলা খিল্ খিল্ করে হেসে বললে, "আমি কে চিনিস না? আমি তোর দিদির সই অমলা, আমার ঘর ঐ যে দেখা যাচ্ছে"—বলে আঙুল দিয়ে নিজের ঘর দেখিয়ে দিলে।

পূবের আকাশ লাল টক্ টক্ করছে, সূর্য্য উঠে পড়ল ব'লে। অমলা বললে, "আচ্ছা ন্যাকা মেয়ে, সত্যি বলছিস আমায় চিনতে পারছিস না? আচ্ছা, তোর মাকে ডেকে আনি, দেখি চিনিস কি না। এতদিন কোথায় ছিলি?"

পার্ব্বতী বললে, "কে জানে, মনে নেই।"

অমলা এবারে সত্যিই বেশ অবাক হল। এ আবার কি রকম কাণ্ড? পার্ব্বতী কি পাগল হয়েছে? নইলে চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে কখনও সব-কিছু ভুলে যেতে পারে? সে সকলকে খবর দেবার জন্যে জলের কলসী ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে চলল।

দেখতে দেখতে নদীর ঘাটের কাছে ভীড় জমে গেল। সবার আগে ছুটে এল পার্ব্বতীর মা, বাবা, ভাই-বোন সকলে। পার্ব্বতীকে ফিরে পেয়ে কি আনন্দ তাদের। সবাই মিলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কত প্রশ্ন যে করতে লাগল, তার ঠিকানা নেই। পার্ব্বতী কিন্তু কোনও কথার জবাব দিল না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। কথা ব'লে ব'লে এবং উত্তর না পেয়ে হয়রান হয়ে শেষে পার্ব্বতীর মা-বাবা তাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। গাঁয়ের লোক এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলাবলি করতে করতে যে যার কাজে চলে গেল।

পার্ব্বতী আর কোনও দিন আগেকার স্মৃতি ফিরে পেল না।

তবে নিজের পরিবারের লোকদের সঙ্গে আবার সে নূতন ক'রে পরিচয় করে নিল, কাজেই কাজ চলতে লাগল, কোনও অসুবিধা হল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা সকলের সয়ে গেল।

বসন্তকাল কেটে গ্রীষ্মের দিন এসে পড়ল। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে, বাইরের দিকে তাকাবারও জো নেই। তাও দেখতে দেখতে কেটে গিয়ে পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটাবার জন্য মুষলধারে বৃষ্টি নামতে লাগল। পথ, ঘাট, মাঠ—সব জলে জলময়। তরঙ্গিণীর তরঙ্গ আরও উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল, ক্রুদ্ধ অজগরের মত সে কেবল ফুলে ফুলে উঠছে। গ্রামের লোক বন্যার ভয়ে কাতর, না জানি কখন কি সর্ব্বনাশ হয়।

এমনই একটি বর্ষার সন্ধ্যায় অমলা সাবধানে পা ফেলে কলসী নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে নদীর ঘাটে। এখনও দিনের আলো যেটুকু আছে, তারই মধ্যে কাজ সেরে তাকে ফিরে যেতে হবে, তাই যতদূর পারে তাড়াতাড়ি সে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারটা তার মনের ভিতরটাকেও যেন আঁধার ক'রে দিয়েছে।

ঘাটে সর্ব্বদাই খেয়া নৌকা বাঁধা থাকে, ওপারের গাঁয়ের সঙ্গে এই নৌকার সাহায্যেই যোগ রাখতে হয়। অমলা দেখলে, নৌকার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে একটি মেয়ে, তারই মত বয়স হবে। এমন সময় নৌকায় ব'সে মেয়েটি কি করছে জানতে অমলার একটু কৌতূহল হল, সে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ওখানে কি করছ গা?"

মেয়েটি বললে, "আমি শাঁখা, চুড়ি বেচতে এসেছি। ভারি সুন্দর সুন্দর চুড়ি আছে আমার কাছে, তুমি নেবে?"

"দেখি কেমন চুড়ি?" বলে অমলা ঘাটের সিঁড়ি ক'টা নেমে নৌকার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি সবলে এক টান দিয়ে মেয়েটি তাকে নৌকায় তুলে নিল, আর নৌকাও তরতর করে চলতে আরম্ভ করল।

অমলা চীৎকার করে কেঁদে উঠল, কিন্তু কেই বা তার কান্না শুনছে? নৌকাটা দেখতে দেখতে মাঝ-নদীতে এসে পড়ল। ঘাটে সে-সময় আর কেউ ছিল না, কাজেই অমলার অপহরণের কথা কেউই জানতে পারল না। অমলা অবাক হয়ে দেখল, যে-মেয়েটি তাকে নৌকায় টেনে তুলেছিল, সে আর নৌকায় নেই, তার বদলে কয়েকজন অদ্ভুত চেহারার এবং অদ্ভুত পোষাক-পরা নাবিকের মত মানুষ দাঁড় টানছে। নৌকাটাও গেছে একেবারে বদ্‌লে। সেই শ্যাওলা-ধরা কাঠের খেয়া নৌকা আর নেই, মস্ত বড় শাদা ধব্‌ধবে জাহাজ, পাল তুলে দিয়ে বাজপাখীর মত উড়ে যাচ্ছে। কোথায় অমলাকে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? ভয়ে অমলার বুক কাঁপতে লাগল, কিন্তু কৌতূহলও কম হল না। কে এরা? কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে? কেন নিয়ে যাচ্ছে? যে লোকটা হাল ধরে ছিল, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

লোকটি বললে, "দেখতেই পাবে। তোমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই!" বলেই সে আবার নিজের কাজে মন দিল। অমলা বুঝল, সে ব্যক্তি তার আর কোনও কথার জবাব দেবে না, কাজেই আস্তে আস্তে সে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। লোকটি তাকে যদিও আশ্বাস দিল, তবু অমলার ভয় গেল না। বাপ, মা, ভাই-বোন কেউ তার নেই, কাজেই কাউকে ছেড়ে যেতে যে তার মন কাঁদছিল তা নয়, তবু নিজের অদৃষ্টে কি না জানি আছে, তারই আশঙ্কায় তার বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠছিল।

গভীর রাত্রি নেমে এল, জলের রং যেন কালির মত কালো হয়ে উঠল। নাবিকদের ভিতর একজন পথ দেখিয়ে অমলাকে জাহাজের একটি কামরার ভিতরে নিয়ে গেল। সেটি এমন সুন্দর ক'রে সাজান যে দেখলে দুদণ্ড খালি চেয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। শাদা একটি পাথরের টেবিলের উপর থরে থরে কত রকম সুন্দর, সুগন্ধ খাবার সাজান! অমলা কিন্তু সে-সব কিছু ছুঁলও না। চুপ করে গিয়ে

বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনে খুব উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও খানিক পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম যখন ভাঙল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল। এ কি, তারা কি সমুদ্রে এসে পড়েছে না কি? চারিদিকে থৈ থৈ করছে নীল জল, ডাঙ্গার চিহ্নও দেখা যায় না। অমলা বিছানা ছেড়ে বাইরে ছুটে গেল। না, সমুদ্র নয় বটে, তবে তারই কাছাকাছি,—প্রকাণ্ড এক নদী। তাদের গ্রামের তরঙ্গিণী নদীকে তারা বড় বলে জানত, এর কাছে সেটা ত নৰ্দ্দমার মত। দূরে, অনেক দূরে, আকাশের কোলে নীল রেখার মত গাছের সারি যেন দেখা যাচ্ছে। তাহলে ঐখানেই যাচ্ছে তারা? ওটা কাদের দেশ?

নাবিকরা আবার অমলাকে খাওয়াবার চেষ্টা করল, অমলা কিন্তু দু-এক-টুকরা ফল ছাড়া আর কিছু ছুঁলও না। বার বার ক'রে তাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, কেন নিয়ে যাচ্ছ?" কিন্তু উত্তর কিছুই পেল না।

বর্ষার সকালের মেঘলা কেটে গিয়ে, এক ঝলক রোদ নদীর জলের উপর এসে পড়ল। জলটা ঠিক ইস্পাতের খাঁড়ার ঝক্‌মক্ করতে লাগল, সেদিকে তাকালে চোখ ঠিকরে যায়। দূরের সেই গাছের সার ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, জাহাজটা সেদিকেই চলেছে। ক্রমে প্রাসাদের ছাদ, মন্দিরের চূড়া, পাহাড়ের মাথা এক-এক ক'রে দিগন্তের গায়ে ফুটে উঠতে লাগল। অমলারা প্রকাণ্ড এক নগরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ে গেল। সেখানে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছে, হাতী, ঘোড়া, রথ, চতুর্দ্দোলা কত কি নিয়ে। পোষাক তাদের হাজার রঙে রঙীন, ধরণটা নূতন। এ ধরণের পোষাক অমলা আগে কখনও দেখেনি। দেশটাও অদ্ভুত সুন্দর, ঠিক যেন স্বপ্নের দেশ, নয় ত উপকথার দেশ। সব জিনিষই

চেনা চেনা লাগে অথচ ঠিক চেনা নয়। সাধারণ জিনিষকে নিপুণ চিত্রকরের আঁকা রঙীন ছবিতে যেমন অসাধারণ দেখায়, এ যেন সেই রকমেরই। অমলা হাঁ ক'রে এই অপূর্ব্ব দেশের দিকে চেয়ে রইল।

ছোট একটা নৌকায় চ'ড়ে একজন মানুষ জাহাজে এসে উঠল, তার সঙ্গে সাদা রঙের একটা সিন্ধুক, সেটা হাতীর দাঁতের কি পাথরের, তা কে জানে? অমলার সামনে বাক্সটি নামিয়ে সে ডালাটা তুলে ধরল। ভিতরে একটি পোষাক, আর কতকগুলি গহনা। সে শাড়ীর আর গহনার রূপ দে'খে অমলার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। এটা কাদের দেশ? সত্যিই কি অমলা উপকথার দেশে এসে পড়েছে? এত সুন্দর জিনিষ সত্যিকার জগতে কি থাকে?

অমলার সামনে বাক্সটা নামিয়ে সে ডালাটা তুলে ধরল

লোকটি বললে, "আপনি পোষাক বদলে নিন, মহারাজ তীরে অপেক্ষা করছেন।"

অমলা অবাক হয়ে বললে, "মহারাজ কেন আমার জন্যে অপেক্ষা

করছেন? আর আমি এত দামী সব জিনিষ তোমাদের কাছ থেকে নেব কেন? আমি ত তোমাদের চিনি না?"

লোকটি বললে, "আপনি আমাদের মহারাণী হবেন। রাজ্যে যত ধনরত্ন আছে, সবই ত আপনার।"

অমলা এতই অবাক হয়ে গেল যে, তার মুখে কোনও উত্তর জোগাল না। কোথাকার পাড়াগাঁয়ের গরীব মা-বাপ-হারা মেয়ে সে, সে হবে কিনা এই আশ্চর্য্য সুন্দর দেশের রাণী? এ যে শুনলেও বিশ্বাস হয় না। অমলা কি স্বপ্ন দেখছে, না জেগে আছে? নিজেকে খুব জোরে চিমটি কেটে, চোখ দুটো খুব ভাল ক'রে ঘ'ষেও অমলা কিন্তু এই স্বপ্নটা ভাঙ্গতে পারল না। অগত্যা তাকে স্বীকার করতে হল যে সে জেগেই আছে।

তীরের লোক-লস্কর ক্রমেই অধৈর্য্য হয়ে উঠছে বোঝা গেল। অমলার আর দেরি করতে সাহস হল না। সে শাড়ী, জামা আর গহনা নিয়ে তাড়াতাড়ি কামরার ভিতর ঢুকে গেল, পোষাক বদলাতে। নূতন সাজে সেজে সে যখন দেওয়ালে টাঙান বড় আয়নাটার দিকে তাকাল, তখন আর নিজের আগের চেহারা খুঁজে পেল না। সেও যেন এর মধ্যে এ দেশের মানুষগুলির মত হয়ে গেছে। মনটা তার কেমন যেন একটা অদ্ভুতভাবে ভ'রে উঠল।

অমলা বাইরে এসে দাঁড়াতেই, তীরের লোকেরা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। মস্ত বড় সোনার রথ ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। জাহাজ থেকে তীরে নামবার জন্য হড়হড় করে সিঁড়ি নেমে গেল। নাবিকেরা তার উপর পেতে দিলে লাল মখমলের আস্তরণ। অমলা আস্তে আস্তে তার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সোনার রথে উঠে পড়ল। সমুদ্রের ফেনার মত শাদা ঘোড়া চারটে এতক্ষণ অসহিষ্ণুভাবে মাটিতে পা ঠুকছিল। তারা এইবার ছুটে চলল বাতাসের আগে আগে, পিছন পিছন চলল আরও যত সব রথ, ঘোড়া, হাতী আর মানুষের দল।

রথ গিয়ে থামল মস্ত এক প্রাসাদের সামনে। শাদা আর রঙীন পাথর মিলিয়ে প্রাসাদটি গড়া, তার আনাচে-কানাচে সোনা-রূপো-মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি। পথ-ঘাট সব রূপোর, গাছপাতা-ফুল-ফল এমন ঝকমক করছে যে সেগুলিও যে মণি-মাণিক্য দিয়ে গড়া, তা বুঝতে দেরি হয় না। প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে, রথ এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড এক মর্ম্মর-পাথরের সিঁড়ির সারির সামনে। সেইখানে এই দেশের রাজা দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর নূতন রাণীকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

অমলা মহারাজের দিকে চেয়ে দেখলে। এখানের সবই সুন্দর, মহারাজ যেন সব চেয়ে সুন্দর। মাথায় তাঁর হীরার মুকুট, হাতে হীরার রাজদণ্ড। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে তিনি অমলাকে হাত ধ'রে রথ থেকে নামিয়ে নিলেন।

দু'জনে মিলে প্রাসাদের ভিতর ঢুকে সব ঘরগুলি আর তার আশ্চর্য্য সুন্দর গৃহসজ্জাগুলি দে'খে দে'খে বেড়াতে লাগলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "অমলা, তোমার ঘর পছন্দ হয়েছে? এই বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগবে?"

অমলা বললে, "বাড়ীটা ত খুব সুন্দর, তবে এখানে থাকতে ভাল লাগবে কিনা জানি না।"

মহারাজের সুন্দর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, তিনি অমলাকে প্রাসাদের আর-এক দিকে নিয়ে চললেন। এটা তাঁদের ধনাগার, এখানে রেশম, কিংখাব, মখমলের ছড়াছড়ি, মণি-মুক্তা-হীরা চারিদিকে গড়াচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ যত ঐশ্বর্য্য যে কোনও সময় কল্পনায় এনেছে, সব এখানে দেখা যায়।

মহারাজ বললেন, "অমলা, এসব তোমার হবে। এত ধনরত্ন পেয়েও কি তুমি খুশি নও?"

অমলা বললে, "এগুলি দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, কিন্তু এগুলি আমার হবে মনে ক'রে কিছু বেশী আনন্দ হচ্ছে না।"

মহারাজ আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর অমলাকে প্রাসাদের অন্যদিকের আর-একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "তুমি এখানে এখন থাক। ঐ রূপোর ঘণ্টাটি বাজালেই দাসদাসীরা এসে তোমার হুকুম পালন করবে। আমি কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব। প্রাসাদটা আরও ভাল ক'রে দেখ, তাহলে হয়ত এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছা করবে।"

অমলা বললে, "যাবার আগে আমায় ব'লে যান, আমায় কেন এরকম ক'রে ধ'রে আনা হল!"

মহারাজ বললেন, "আমার রাণী হবার জন্যে। এ দেশের নাম কল্পরাজ্য, এখানের রাজা রাণী সব বাইরের থেকে নিয়ে আসতে হয়। লোকজন যাদের এখানে দেখছ, সবই অন্য জায়গা থেকে এসেছে, এখানে কারও জন্ম হয়নি। এখানে এসে খুসি মনে থাকতে হয়, না হলে এ রাজ্যে থাকবার নিয়ম নেই। যে দেশ ছেড়ে আসবে, সেখানের কোনও কিছুর জন্যে যদি মনে দুঃখ হয়, তা হলে তখনই যেখানকার মানুষ, সেখানে ফিরে যাবে।"

অমলা জিজ্ঞাসা করল, "পার্ব্বতীকে কি তোমরাই ধ'রে এনেছিলে?"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু অনেক দিন এখানে থেকেও তার মন বসল না, খালি মা, বাবা, ভাই-বোনের জন্য সে কাঁদত, তাই তাকে ফিরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

অমলা জিজ্ঞাসা করল, "সে কিছু মনে করতে পারে না কেন?"

মহারাজ বললেন, "আমরা যাকে ফিরিয়ে পাঠাই, তার স্মৃতি কেড়ে নিই, নইলে আমাদের এই গুপ্ত-রাজ্যের পথ সবাই জেনে নেবে যে?"

মহারাজ চলে গেলেন। সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে অমলা এই অতি আশ্চর্য্য প্রাসাদের সব ঘর দেখতে লাগল। যত দেখে, তত তার বিস্ময় বেড়ে যায়। দাস-দাসীরা তার হুকুম পালনের জন্য

চারিদিকে ঘুরছে, কিন্তু অমলা কি হুকুম দেবে ভেবে পায় না। চারিধারের ঐশ্বর্য্য দেখে তার চোখ যত মুগ্ধ হচ্ছে, মন তত ভার হয়ে আসছে। কোনও কিছুতেই যেন আনন্দ নেই, কোনও জিনিষকেই নিজের বলে মনে হয় না। সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলে উঠল, অমলা তখন ম্লান মুখে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। এত আলোর ঝক্‌ঝকানি তার আর ভাল লাগছিল না।

পরদিন ভোর হতেই নহবতের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের রথ এসে প্রাসাদের সামনে দাঁড়াল। শাদা-পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে, হীরার মুকুট পরা মহারাজ অমলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অমলা, আজ কেমন লাগছে এ দেশটা?"

অমলা ম্লান মুখে বললে, "আগেরই মত।"

মহারাজ বললেন, "তোমার বাপ নেই, মা-ভাই-বোন কেউ নেই, তুমি গরীব অনাথিনী মেয়ে। কিসের টানে আবার সেই দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে যেতে চাও?"

অমলা বললে "মহারাজ, আমি আমার সেই বাগানের মধ্যে কুটীরখানি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সেই ঝুমকো লতার বেড়া, সেই বকুল-টগর-করবীর গাছ, সেই মাধবীলতার কুঞ্জ, বর্ষার জল প্রথম পৃথিবীর বুকে পড়লে যে সুগন্ধ বেরিয়ে আসে মাটীর বুকের থেকে, তা যেন আমাকে ডাকছে। আমাদের তরঙ্গিণী নদীর ঢেউগুলি আমায় ডাকছে। মাটীর মায়া আমি ছাড়তে পারব না, আমি ফিরে যেতে চাই।"

রাগে মহারাজের মুখ কালো হয়ে উঠল, যেন ঝড়ের মেঘের মত। হাতের হীরার দণ্ড অমলার কপালে ছুঁইয়ে বললেন, "ফিরে যাও নির্ব্বোধ মেয়ে। এখানের সব স্মৃতি তোমার মন থেকে মুছে যাক।"

অমলা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। হাত জোড় করে বললে, "দোহাই মহারাজ, এমন শাস্তি আমায় দেবেন না। পার্ব্বতীর মত জড়-বুদ্ধিহীন হয়ে আমি বাঁচতে পারব না। আমার মা, বাবা, ভাই-বোন, সবাই

আমায় ছেড়ে গেছে, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তারা বেঁচে আছে। আমার ছেলে-বেলাকার সুন্দর দিনগুলি, আকাশের কত রং, আমার বাগানের কুটীরের কত ছবি, সব আমার মন জুড়ে আছে। সব গেলে, আমার বেঁচে কি হবে?"

মহারাজ বললেন, "আচ্ছা, তুমি নির্ব্বোধ হলেও, স্বভাব ভাল। তোমায় আমি বেশী কঠিন শাস্তি দেব না। এখানকারই স্মৃতি শুধু তোমার মন থেকে মুছে যাবে, আর আগেকার সব কথা মনে থাকবে। পার্ব্বতী বড় লোভী, তাই তার শাস্তিও বেশী। সে লুকিয়ে এখানকার বাছা বাছা মণিমুক্তা নিয়ে যাচ্ছিল।"

অমলা মহারাজকে প্রণাম করে বললে, "বিদায়, মহারাজ! এখানকার আর সব ভুলব বলে দুঃখ হচ্ছে না, আপনার দয়ার কথা ভুলব এই আমার দুঃখ"—বলতে বলতে কল্পরাজ্য যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

অমলা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌ল। ভাবলে, "মা গো মা, আমার হয়েছে কি? অন্ধকার হয়ে এল, আর আমি এই ভর-সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে ব'সে ঢুলছি? এখন পথ দেখে বাড়ী ফিরে যেতে পারলে হয়।"

তাড়াতাড়ি এক কলসী জল তুলে নিয়ে অমলা হন্ হন্ ক'রে বাড়ীর দিকে চলতে লাগল।

—শেষ—